সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা বিধেয়।

যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে জয় করত ক্ষমাশালী হয় সেই ব্যক্তিই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ; তাহারই সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পবিজ্ঞান-সম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। (ঐ—১০০

বিদুর।—স্বধনে পরিতৃপ্ত হওয়া ও পরধনে লোভ না করাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়—২১

ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণতা যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমরা বহুদিন যাবৎ এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এতদিন কোথাও সঙ্কীর্ণতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে দেখি নাই। সম্প্রতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে "যুবক"সম্প্রদায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাদের অন্তরের সাম্প্রদায়িক ও সুতরাং সঙ্কীর্ণ ভাব বড়ই বেশী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পত্রিকার পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর বহির্ভূত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু-পরিবার যে উক্ত মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন, সেদিকে "যুবক"সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা ঢাকায় অবস্থানকালেও ব্রাহ্মদিগের এই সঙ্কীর্ণতার কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্যতর মুখপত্র "যুবক"-পত্রের গত ভাদ্রসংখ্যায় শ্রীমান সুললিত সরকারের পত্র পাঠ করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিলাম। উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে—"বিবাহ আদিসমাজমতে আচার্য্য দ্বারা ও হিন্দু-সমাজমতে পুরোহিত দ্বারা উভয়বিধ উপায়ে সম্পন্ন হইয়াছে"। এই কথা সুললিতবাবু নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটনা না জানিয়াই লিখিয়া থাকিবেন, কারণ উহা একটুও ঠিক নয়। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও সুললিতবাবু জানিতে পারিতেন যে, আদিসমাজের পদ্ধতিতে যে উপাসনা ও উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য অবধারিত আছে, তাহা সাধারণত বেদী হইতে আচার্য্য করেন; এবং সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি বিবাহসম্বন্ধীয় অবশ্যকর্ত্তব্য সাধনের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়, সেগুলি সাধারণত পুরোহিতের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম্ভব হইলে একই পদ্ধতির উক্ত দুইটী অঙ্গ অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষার জন্য দুই ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়; অভাব পক্ষে একই ব্যক্তির দ্বারা উক্ত দুইটী কার্য্যই সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মসমাজ অসাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্য, সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণের জন্য অবতীর্ণ। ব্রাহ্মসমাজে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার অবকাশ নাই। ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা বাঁচাইতে চাই, তবে ইহা আদিসমাজ, উহা সাধারণ সমাজ এ দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না—ব্রহ্মোপাসক সকলেরই মিলিতভাবে ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতাজনিত সঙ্কীর্ণতার কারণে ব্রাহ্মসমাজ যে কোন্ পথে চলিতেছেন, তাহা এখনও আমরা দেখিতেছি না। ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলী হইতে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে একে একে কত সভ্য যে সরিয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন, তাহা আমাদের অনেকের প্রত্যক্ষ হইলেও আমরা একচক্ষু হরিণের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মনে স্থান দিতে চাই না—মরণের পথ সম্মুখে বিস্তৃত দেখিয়াও দেখিতে চাই না। সঙ্কীর্ণতার বেষ্টনে ব্রাহ্মসমাজকে ঘিরিয়া রাখিয়া বিনাশের পথ প্রশস্ত করিবার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এই সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণের একটী প্রধান উপায় হইতেছে বালকদিগের মনে ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করা। বাল্যকাল অবধি ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় অসাম্প্রদায়িক ভাবে লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই ঐ প্রকার শ্রদ্ধা ও আস্থা আসিতে পারে এবং অবিচলিত থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শাখার প্রকাশিত অসাম্প্রদায়িক ভাবে লিখিত বালোপযোগী পুস্তকের এক-একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া একটী ক্ষুদ্র আলোচনা কমিটির হস্তে প্রদান করিলে ভাল হয়। সেই কমিটি সেই তালিকা হইতে আর একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রতি বৎসরের জন্য প্রস্তুত করিবেন। সেই তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মসমাজ বা যে কোন ব্রাহ্মের অধীনস্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়ানো উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রকার ব্যবস্থা করিলে সঙ্কীর্ণতা অচিরেই দূরীভূত হইবে।

কালা-আজার ও সার উইলিয়াম লীষম্যান।

(Sir William B. Leishman K,C.M.G , C. B., F. R. S,)

(ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস্‌সি)

প্রথিতযশা ডাক্তার লীষম্যান চিকিৎসকজগতের এক মুকুটমণি। অল্পদিন হইল হঠাৎ তাঁহার অভাব হইয়াছে। ভারতের কালা-আজার ব্যাধির নিদান তাঁহারই চেষ্টা ও গবেষণায় নিরাকৃত হইয়াছিল। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকের উপাধি লইয়া ১৮৮৭ সনে সৈনিক-বিভাগের ডাক্তার হন। ১৯০০ সনে যখন Sir David Se:nple ভারতে কাজ লইয়া আসেন তখন লীষম্যান নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমরা সংক্ষেপে কেবল তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের উল্লেখ করিব। রোগের বীজাণু পরীক্ষায় ও আবিষ্কারে নানারূপ রঞ্জন-প্রণালীর অনুশীলন আবশ্যক হয়। লীষম্যানই প্রথম বিশিষ্ট রঞ্জনপ্রণালীর পথ দেখাইয়া অনেকগুলি অদৃষ্ট বীজাণুকে অণুবীক্ষণের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন। তিন বৎসরের ক্রমিক চেষ্টায় তাঁহার নিজ প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া ১৯০৩ খৃঃ অব্দে দমদমের একটি পীড়িত সৈনিকের প্লীহার অংশবিশেষে এক অপূর্ব্ব-দৃষ্ট লাঙ্গুলবিশিষ্ট বীজাণু দেখিতে পান। এই বীজাণু ইন্দুরের রক্তপ্রবাহে ঢুকাইয়া ইহার স্বরূপের সঙ্গে আফ্রিকার অতি সাংঘাতিক নিদ্রাতুর ব্যাধির (sleeping sickness) জনক ট্রাইপ্যানোসোম (trypanosome) বীজাণুর সাদৃশ্য সপ্রমাণ করেন। এইরূপে ১৯০৩ খৃঃ অব্দে কালা-আজারের নিদান স্থির করিয়া যে মাসে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ইহার পরই জুলাই মাসে ডাক্তার ডনোভান মাদ্রাজের অনেকগুলি প্লীহাগ্রস্ত রোগীর প্লীহার রক্ত হইতে এই বীজাণু পাইবার সংবাদ প্রকাশ করিয়া লীষম্যানের নিদান সমর্থন করেন। ইহার কিছু পরেই "দিল্লীস্ফোটকে" এই বীজাণু পাওয়া যায়। এবং এই একই বীজাণু যে আসামের কালা-আজার এবং দিল্লীস্ফোটকের জনক তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়। আর আসামের বাহিরেও যে এই রোগপ্রসারের অনেক কেন্দ্র রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। লীপজিগ নগরে চীন হইতে প্রত্যাগত বক্সার যুদ্ধে আহত একটি সৈনিকের প্লীহাতেও এই বীজাণুর সন্ধান পাওয়া যায় এবং প্রমাণ হয় যে, চীনদেশও এই কালা-আজার রোগের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র।

কলিকাতার ডাক্তার রজার্স সাহেব এই বীজাণুকে প্রাণীর শরীরের বাহিরে পোষণ করিয়া ইহাকে ট্রাইপ্যানোসোম-জাতীয় * বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী নবেম্বরে ম্যালেরিয়া বীজাণুর আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার রোণাল্ড-রস এবং ১৯০৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লীষম্যান স্বয়ং প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে এই বীজাণু নিদ্রাব্যাধির জনক ট্রাইপ্যানোসোম হইতে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় জীব এবং এক প্রকার মাছির উদরে ঐরূপ বীজাণুর অনুরূপ আর একটি বীজাণু পাওয়া যায়। আর বিশ বৎসর পর অনেক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান করা হইতেছে যে এক প্রকার বালু-মক্ষিকার (sand-fly) উদরে এই কালা-আজার ও দিল্লীস্ফোটকের জনক বীজাণুর বাসস্থান।

কালা-আজারের বীজাণু ব্যতীত উকুনের উদরেও তিনি আর এক প্রকার বীজাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহাও এক প্রকার সাংঘাতিক জ্বর (Typhus জাতীয়) সংক্রমণ করে। টাইফয়েড জ্বরের প্রতিষেধক টীকার আবিষ্কার ও প্রচলনে লীষম্যান অনেক চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মানুষের রক্তে শ্বেতকণিকার কার্য্যকরী শক্তির ও সংক্রামক রোগ নিবারণকারী শক্তির অনেক তত্ত্ব লীষম্যান সমাধান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ যশস্বী চিকিৎসক ও নিদানতত্ত্ববিদের মৃত্যুতে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ভারতবর্ষ রোগের আকর এবং আমাদের প্রতি গৃহ ব্যাধিমন্দির। যে সব মহাত্মা আমাদের এই সব আধিভৌতিক বিপদ-জালের নিরাকরণে সাহায্য করিতেছিলেন তাঁহাদের হঠাৎ অভাব আমাদের হতাশ্বাসের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। সুশ্রুত, বাগ্‌ভট ও মাধবের দেশে আজ রোগমূলের আবিষ্কর্ত্তার অভাব হইয়া পড়িয়াছে! তাই বিদেশী বুধগণ আমাদের প্রাণান্তক রোগের নিদান স্থির করিয়া আমাদের রক্ষার উপায় করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা সঙ্গত।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

ভৈরবী—একতালা।

মম অন্তর হতে ঝঙ্কৃত শত ক্রন্দনযুত বন্দনা,
তোমার অযুত শ্রবণে ধ্বনিত মোহন গাতি-মূর্চ্ছনা।

---

* আজকাল "কালাজ্বর" বলিয়া যে প্রচলিত কথা শুনিতে পাওয়া যায় উহা আসামী ভাষায় কালা-আজার। আজার শব্দে মৃত্যু বুঝায়। ঐ ব্যায়রামে রোগীর শেষ অবস্থায় কালা-শির পড়ে বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

আমি নীরবে গেয়েছি যত গান
তুমি সকলি শুনেছ ভগবান
মম সঙ্গীত-রস করি পান, তুমি মোরেই করেছ বঞ্চনা।
ওগো ও-ছলে ভুলি না আমি আর
তাই বেঁধেই রেখেছি হৃদি-তার
তুমি বাজাবে স্বকরে অনিবার, তুলি সুমধুর সুর-ঝঙ্কনা।
আমি বিজনে একাকী সাথী-হীন
ভয়ে ক্ষীণ তনু, আমি অতি দীন
তুমি এস প্রিয়তম নিশিদিন মোর রবেনাক কেন যন্ত্রণা॥

গ্রন্থ-পরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্‌-সি)

সুকথা (দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুগণের জন্য)।— 'মল্লিকা' ও 'অঞ্জলি' রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক :—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌ ৬৫ কলেজষ্ট্রীট্ কলিকাতা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ। মূল্য এগার পয়সা মাত্র।

লেখিকা 'সাধক রামপ্রসাদ' ও 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী। এই সচিত্র পুস্তকটীতে শিশুদের উপযোগী নানা বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষকমহাশয়গণ অনায়াসে এই পুস্তকটী স্ব স্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত করিতে পারেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহার উপযোগিতা জানা যায়। 'এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট'ও ইহা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ যদি এই পুস্তকটী তাঁহাদের বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলন করেন তবে তাঁহাদের ত কোনই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু এই দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

সংবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—"গ্যালারি"র রুচির অনুসরণই বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকার একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেবল তত্ত্ববোধিনীই এ পর্য্যন্ত এই প্রলোভনের পথ অতিক্রম করিয়া এই সুদীর্ঘ ৮৪ বৎসর যাবৎ কেবল আপনার সত্য আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। সুখের বিষয়, ইহার অসাম্প্রদায়িকতা ও সত্যপ্রিয়তা অধুনা অনেকের দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। সম্প্রতি বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন আয়ুর্ব্বেদরত্নাকর মহাশয় আমাদিগকে এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা আনন্দের সহিত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"আপনার তত্ত্ববোধিনী আমি নিয়মিতরূপে আন্তরিকতার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করি। এরূপ সাম্প্রদায়িকতাশূন্য নিরপেক্ষ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাগজ বর্ত্তমানে নাই। যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় এই কাগজকে নিজের সম্প্রদায়ের কাগজ বলিয়া মনে করিতে পারেন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ও সৎসাহিত্যের প্রচার করুন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়কে অন্যতম সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির সমাদর করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্ভীক ও ওজস্বিনী রচনা পাঠ করিয়া আমি ক্রমশঃ তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিতেছি।"

আয়-ব্যয়।

১৮৪১ শক, সন ১৩৩২ সাল।

আয়	৭৭২৮৸৶৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৩৷৵৯
সমষ্টি	৭৭৭২৷৵৬
বাদ খরচ	৭৭৫৫৷৹
স্থিত	১৭৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২০০০৲
বাৎসরিক দান	৫৲
উৎসবের দান	২৯৮৹
আনুষ্ঠানিক দান	১১৸৵৹
এককালীন দান	৩৲
বণ্ডেড অয়ার হাউসের ডিভিডেণ্ড	১০৲
বিবিধ	৮৷৶৩
ঋণগ্রহণ	৩০৫৲৵৩
সমষ্টি	৪২১৪৷৵৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	১৪৯৷৶৹
হাল	১৫০৲
বিজ্ঞাপন	২১৯৲
মাশুল	২৪৶৹
নগদ	৩৲
অগ্রিম	১০৸৵৹
সমষ্টি	৫৫৭৶৹

যন্ত্রালয়।

পুস্তক মুদ্রণ	২১৬৲
কাগজ	২৪৸০
দপ্তরী	৪৪৷৷৵৩
অন্যান্য	৩৫৷৶০
	৩২১/৩

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৩৪৸/০
গচ্ছিত পুস্তক	৫৩৸৵/০
মাশুল	৬৷/০
গীতারহস্যের মূল্য	১৪৫৫৲
গীতারহস্যের মাশুল	৮৫৸৵/০
সমষ্টি	১৬৩৫৸৵/০
সর্ব্ব সমষ্টি	৭৭২৮৸৵/৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	৮৫৯৸/০
ইলেকট্রিক লাইট	৪০/০
ইলেকট্রিক মেরামত	৩৩৮৲
ট্যাক্স	২৩৬৷৵/০
লাইসেন্স	১২৲
মাঘোৎসব	১০৪৷৷/৩
হারমোনিয়ম মেরামত	২০৲
অন্যান্য	৩০৭৷৶৬
ঋণশোধ	১৪২৯৵/৩
সমষ্টি	৩৩৪৭৷৶০

তত্ত্ববোধিনী।

বেতন	১১৬৷/০
দপ্তরী	২৫৷৷৵/৬
মাশুল	৮৪৷৷৶৯
অন্যান্য	৬৬/৯
কাগজ	১৪৯৷৬
কমিশন	২২৷৷০
মুদ্রাঙ্কন	২৮৲
প্রবন্ধ	৮৲
সমষ্টি	৫০০৷৷/৬

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৮৬৸৯
কাগজ	৯৯/৩
দপ্তরী	৭৩৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১৯৩৸৵/০
বিবিধ	১৩৯/০
সমষ্টি	১৮৯১৸৵/০

পুস্তকালয়।

কাগজ	৩২/০
বেতন	৬৭৵/০
মাশুল	১৮৷৵/৩
দপ্তরী	১৯৫৵/৬
গীতারহস্যের মূল্য	১১৩০৷৶০
গীতারহস্য বাঁধাই	১৬২৷৵/০
গীতারহস্যের মাশুল	৮৪/৬
গীতার কমিশন	২৩৭৷৵/৩
অন্যান্য	৮৮৷৷৵/০
সমষ্টি	২০১৫৷৷৵/৬
সর্ব্বসমষ্টি	৭৭৫৫৷০

আয়-ব্যয়।

১৮৪৮ শকের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক অবধি সাত মাসের হিসাব।

আয়	৬৫২৬৷৷/৩
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭/৬
সমষ্টি	৬৫৪৩৷৷৵/৯
ব্যয়	৬৫৩৫৸৶/৯
স্থিত	৭৷৷৶/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বাৎসরিক দান	৬৸/০
এককালীন দান	২৫৲
আনুষ্ঠানিক দান	১৫৲
বিশেষ কার্য্যের দান	২৲
বণ্ডেড্ অয়ার হাউসের ডিভিডেণ্ড	৫০৲
কোম্পানি কাগজের সুদ	৫৫৶০
কোম্পানি কাগজ বিক্রয়	২২৯০৸০
হাওলাত আদায়	৮১৲
সস্পেন্স আদায়	১৩৮৲
ঋণগ্রহণ	১৭৫২৷৷/৩
হাওলাত জমা	২৷/০
সমষ্টি	৪৮৬৮৷৷৵/৩

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৮৯৸৶০
হাল	৫৬৸/০
বিজ্ঞাপন	৭৯৲
মাশুল	৮৷৷০
নগদ	৷৷৵/০
সমষ্টি	২৩৪৸৵/০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৫৮৲
কাগজের মূল্য	১৬৪৸০
	২২২৸০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৭৪৸৵/০
গচ্ছিত পুস্তক	২৯৸০
মাশুল	৷৷০
গীতারহস্যের মূল্য	৪৭৪৲
ঐ মাশুল	২১৶০
গীতা তর্জ্জমা	৬০০৲
সমষ্টি	১২০০৷/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বেতন	২৮২৸০
সরঞ্জামী	৪৷৷০৬
মাশুল	৫।/৩
ইলেকট্রিক্	২৬।৵০
কেরাসিন	৪৸০
বারবরদারী	১৭/৬
বিবিধ	১৩৮৸৵৬
পাপাকুলী	১৷৷৵০
হাওলাত প্রদান	৭১৲
সস্পেন্স	১৭৫৷৷০
চারখোনিয়াম মেরামত	৮৲
পার্ব্বণী	১১/০
দান ফেরৎ	১০০৲
হাওলাত শোধ	১৬৵৬
মাঘোৎসব	৩৷৷০৬
আসবাব	৫৮৵৩
লাইসেন্স	১২৲
ড্রেণ পরিষ্কার	৷৷/০
ঋণশোধ	৩০৫১৸৵০
সমষ্টি	৩৯১৬৵০

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজ	১৫৬৲
দপ্তরী	৪৬৸৵০
মাশুল	৩১৲৬
বেতন	১০২৸০
বিবিধ	৩৵
প্রবন্ধ	২৯৸/০
মূল্য আদায়ের কমিশন	৮৲
বিজ্ঞাপন	৪৷৷
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১৷৷৵১০
সমষ্টি	৩৯৩ ৬

যন্ত্রালয়।

বেতন	৭৫৮।৵০
জলপানী	৩৷৷০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১৪/০
কাগজ-ক্রয়	১৫৮৷৷৵৩
কালি	৮।৵০
তৈল	৪৷৷/৬
সাজিমাটী	২৲
রুলঢালাই	২৵০
তামাক	২৸৵৬
ময়দা লেই	৸৵৩
শিরীষ	৩৵০
দপ্তরী	৬৯৷৷০
বিবিধ	২৫।৵০
মাশুল	১৵০
প্রুফ কাগজ	২।০
বাতি	/০
ব্রাস	৶০
সমষ্টি	১০৫৭৷৷৵৬

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	২।০
কমিশন	২৩/০
বেতন	৩৭৷৷
বিবিধ	৷৷৵৯
মাশুল	৫৵৬
গীতারহস্যের বাঁধাই	১০৬৸৬
গীতারহস্যের মূল্য	৫২৬।০
গীতারহস্যের মাশুল	২১।৵৬
গীতার কমিশন	৩৩/০
বিবিধ	৪৷৷/০
বিজ্ঞাপন	৮৲
গীতার তর্জ্জমা	৬০০৲
সমষ্টি	১১৬৯৲৯
সর্ব্বসমষ্টি	৬৫৩২৸৵৯

আদিব্রাহ্মসমাজের ১৮৪৮ শকের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।

গত ৯ই আশ্বিন রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে অধ্যক্ষ সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশক্রমে এবং ট্রষ্টী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতিক্রমে আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথালিখিত পদে নিযুক্ত হইলেন।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্-সি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি।

এবং

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্-সি।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্ সি।

কর্ম্মাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

হিসাবরক্ষক

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০১ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

মুক্তি কোথায়?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কে তুমি অনন্তের পথে চলিয়াছ? অনন্তের পথে তুমি কাহার সন্ধানে চলিয়াছ? কোন্ সুন্দর পুরুষ তোমার মনোহরণ করিয়াছেন? দিকে দিকে ত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহাতেও কি তুমি তৃপ্তিলাভ কর নাই? আরও সৌন্দর্য্য চাও? আমি বুঝিয়াছি—কেন তুমি এত সৌন্দর্য্যের মধ্যেও অতৃপ্তির খুঁৎ-খুঁতানি লইয়া বাস করিতেছ। তুমি এক জন পুরুষ—ইচ্ছাশীল, জ্ঞানবান্ ও সৌন্দর্য্য-বোধবিশিষ্ট পুরুষ; এই সমস্ত জড়ে তোমার অচল সৌন্দর্য্যতৃপ্তি আসিতেছে না। তুমি চাও—নিত্য সচল পুরুষের সৌন্দর্য্যে নিজের সৌন্দর্য্যবোধকে ডুবাইয়া দিয়া আপনাকে নিত্য নব রসে অভিষিক্ত করিতে। ভাল; কিন্তু সেই আসল সুন্দর পুরুষের পূর্ণ সৌন্দর্য্য যদি তোমার সম্মুখে সহসা প্রকাশিত হয়, তাহাই কি তুমি দেখিতে পাইবে? পাইলেও তুমি তাহা ধারণা করিতে পারিবে না—তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। অনন্ত সুন্দর পুরুষের সন্ধানে তুমি যাইতেছ—যাও। কিন্তু তোমাকে আমি একটি রহস্য বলিয়া দিই। সেই সুন্দর পুরুষের আদেশে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে যাইয়া ব্যথা পাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন, এমন অনেক ত্যাগী পুরুষ তোমার যাত্রাপথের দুই ধারে দেখিতে পাইবে। তাঁহাদের চক্ষুর দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিও—দেখিবে, সেই চক্ষুর ভিতর হইতে কি বীর্য্য, কি তেজ, আর সেই সঙ্গে কি মাধুর্য্য, কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহাদের সেই অটল অচল ধৈর্য্যপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতেই সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সকল সৌন্দর্য্যের সুন্দর প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে।

প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে ত সেই মহাসুন্দরের হাতের ছাপ মুদ্রিত আছে। কিন্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় সেই ছাপ আমাদের মনোযোগ ভালরূপ আকর্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টি সেই ছাপের উপর নিপতিত হইলেও কেমন সহজেই পিছলাইয়া যায়; কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিছলাইয়া না যাইয়া আটকাইয়া যায়। প্রলয়ের অনুবোধক ঘোর অন্ধকার নিশীথের গগন আচ্ছাদিত রাখে। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন সেই অন্ধকার কনক-তপনের অরুণ কিরণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে দৃষ্টিসীমান্ত কুজ্ঝটিকার আকারে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে থাকে এবং অরুণ-তপন যখন বিজয়ীর বেশে আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়, তখন সেই আবির্ভাবের মধ্যে সুন্দর পুরুষের সুন্দর হাতের ছাপ বড়ই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় এবং আমাদের মনকে তাহার দিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখে। তাই মনে হয়—বুঝি বা, যেখানে রুধিরাক্ত প্রলয়ের

তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সেই স্থানেই শ্যামল স্বষ্টির নবীন ভাবের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া ব্যাকুলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। তাই বুঝি কবিরা বলেন যে, সৃষ্টি ও স্থিতির ভিতরেও যাঁহার সুন্দর হাতের ছাপ দেখা যায়, প্রলয়ের ভিতরেও তাঁহারই সুন্দর হাতের ছাপ দেখা যায়।

প্রলয়ের ভিতরেও যাঁহার গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তুমি কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? প্রলয়পয়োধি ভেদ করিয়া যিনি এই স্বষ্টিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন, নিজের সৌন্দর্য্যধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য তুমি এ দিক্ ও দিক্ বৃথা ছুটাছুটি করিতেছ কেন? যে দিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই ত প্রতি অণু-পরমাণুরই ভিতরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তবু আমি তোমাকে একটি গুপ্তরহস্যের সন্ধান দিতেছি। তুমি যাহাদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা কর, যাহাদের মুখ দেখিলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা আশঙ্কা কর, সেই সকল পাপীদের মধ্যে যাহারা ফিরিয়া গিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহাদের ভিতরে সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আত্মনিবেদিত পাপীর মধ্য দিয়াই তিনি সব চেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করেন। পাপীর মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ দেখিলে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া তাঁহার সন্ধান করিবার প্রয়োজন হইবে না।

পাপীর ভিতরেও এই প্রকারে ভগবানের আত্মপ্রকাশ দেখিলে কেবল যে তীর্থে তীর্থে ঘুরিবার প্রয়োজন হইবে না, তাহা নহে; কেবল যে তাঁহাকে নির্জ্জনের ভিতরে, আর গভীর ধ্যানের মাঝেই স্বপ্রকাশ দেখিতে পাইবে, তাহা নহে; তখন তুমি তাঁহাকে হাটে ঘাটে-বাটে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই স্বপ্রকাশ দেখিবে; তখন তুমি তাঁহাকে নির্জ্জনের ন্যায় সজনেরও ভিতরে প্রত্যক্ষ করিবে; তখন তুমি তাঁহাকে ধ্যানের মত কর্ম্মের প্রবল-ঝঞ্ঝনার ভিতরেও উপলব্ধি করিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে—কবীর কেন গাহিয়াছেন,—

"পানিমে মীন পিয়াসী রে—
মোক শুনত শুনত লাগে হাসি রে।"

যখন তুমি তাঁহাকে এই প্রকারে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই তুমি তাঁহাকে প্রিয়তম বলিয়া জানিতে পারিবে। তখনই উপনিষদের ঋষিদের মত তোমারও নিকটে তিনি "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য সকল হইতে প্রিয়তমরূপে প্রকাশিত হইবেন। তখন আর তোমার এই জিজ্ঞাসার অবসরই আসিবে না যে, তোমার প্রিয়তম আছেন, কি নাই? তখন ত তিনি তোমার চতুর্দ্দিকেই মহাসত্যরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবেন—তোমায় "নাই" বলিতে দিবে কে? তখন তুমি সুখসমুদ্রের ভিতরেও যেমন তাঁহার বরাভয়প্রদ দক্ষিণ-হস্ত দেখিতে পাইবে, তেমনই দুঃখ-বিপদের ভিতরেও সেই রুদ্রদেবেরই প্রসন্ন বদন দেখিয়া ধৈর্য্যে ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অটল অচল হইয়া থাকিবে।

সেই অটল অচল শ্রদ্ধা-ভক্তি লইয়া যখন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন তোমার সে বল, বীর্য্য ও তেজের সম্মুখে দাঁড়াইবে, কাহার সাধ্য? তখন তোমার রসনা অগ্নিময় হইয়া উঠিবে; তখন তোমার প্রতি বাক্য চতুর্দ্দিকে অগ্নিকণা ছড়াইতে থাকিবে। তখন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া যদি নিহতও হও, তবে ত তোমাকে অভিনন্দন করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য দেবগণের মধ্যে উলুধ্বনি পড়িয়া যাইবে। জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসান উভয়ের প্রতি সমচিত্ত হইয়া যখন তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারিবে, তখন তুমি সংসারে জয়ী হইলেও জয়ী, আর পরাজয় লাভ করিলেও জয়ী। তখন তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—অনন্তকাল ধরিয়া তোমার বিজয়ঘোষণা করিতে থাকিবে।

তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলে ত বিজয়ী হইবেই; কিন্তু এই সর্ব্বস্ব নিবেদন করা কখন্ সহজসাধ্য হয়, তাহা কি জান? আবার একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান দিতে অগ্রসর হইতেছি—অনধিকারীর নিকটে সহজে এই সন্ধানের সংবাদ

দিও না। সুখসম্পদ যখন তোমার হাতের কাছে আসিয়া বিকশিতদন্তে হাস্য করিতে থাকিবে,—ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও—তখন তুমি "তাঁহার চরণে এই সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলাম" বলিয়া বাহিরের লোক-দেখানো ভড়ং করিলেও কিছুতেই সত্য-সত্য সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারিবেই না। সত্য বলিতে কি, তোমার প্রিয়তম সেই লোক-দেখানো পূজা গ্রহণ করিতে আসিবেনই না। কিন্তু, যখন দুঃখ-জ্বালার তীক্ষ্ণধার করাত তোমার হৃদয়ের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া একটা গুপ্ত স্থান প্রস্তুত করিবে এবং সেই স্থানটি যখন তুমি অশ্রুবিধৌত করিয়া সুমার্জ্জিত করিবে, তখনই দেখিবে, তোমার প্রিয়তম কোথা হইতে গুপ্তভাবে আসিয়া সেই গুপ্ত স্থানটি তোমার অজানত অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন এবং অন্য কথা দূরে থাক, তোমার দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেও তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

তিনি যখন তোমার সেই নিবেদিত অশ্রু গ্রহণ করিবেন, তখন সেই অশ্রুই যে তাঁহার আশীর্ব্বরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার অন্তরে বজ্রের বল প্রদান করিবে। অশ্রু তাঁহারই বলের কণা লাভ করিয়া বজ্রের বল ধারণ করিবে। তুমি ত জান যে, তাঁহার বলক্রিয়া লুকানো নাই—প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে তাহা স্বপ্রকাশ। সেই বলক্রিয়ার প্রভাবে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতেছে। সেই বল অপ্রতিহত—কাহার সাধ্য যে, তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহাকে প্রতিহত করে? সেই বলের অধিকারীই যখন তোমার অন্তরে আসন গ্রহণ করিবেন, তখন দুঃখ-দৈন্যই বা কোথায়, নিরাশা-নিরানন্দই বা কোথায়? তখন তুমি স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, ইহা খুবই সত্য কথা যে, তিনি অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল; তিনি অনাথের নাথ। তখন তোমার মন-প্রাণ নিশ্চয়ই আশায় ও আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিবে। তখন তোমাকে দুঃখ-ক্লেশ ব্যথা দিতে পারিবে না; কর্ম্মের ভীষণ গর্জ্জনও তোমার অন্তরের নীরবতা ভাঙ্গিতে পারিবে না। তখন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, যেথানে প্রাণিমাত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, যেথানে নীরবতা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া নিত্য বিদ্যমান, সেথানেও তুমি। আবার সমতল ভূমির কর্ম্মক্ষেত্রে, যেথানে কোলাহল-কলরব, দুঃখ-দৈন্যের ক্রন্দন হাহাকার নিত্য জাগ্রত, যেখানে সংসার-সংগ্রামের উত্তালতরঙ্গ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বজ্রধ্বনি করিয়া তোমায় গ্রাস করিবার বিভীষিকা প্রদর্শন করে, সেথানেও তুমি। তখন তুমি পথহারা পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তির মধ্যে, তাহার হতাশ প্রাণে অতুল বল-বীর্য্য ও শক্তি সামর্থ্য ঢালিয়া দিয়া সহজেই তাহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

তখন তোমার অন্তরে একটা বিরাট বিপুল স্বাধীনতার বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং তাহার প্রতি হিল্লোল মুক্তির অপূর্ব্ব সুগন্ধ বহন করিয়া আনিবে। তখন তোমার অন্তরের সুষুপ্তি বিদূরিত হইবে এবং জাগিয়া উঠিবে—এক বিরাট—মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি। *

পঞ্চব্রাহ্মণের বংশপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৯। পাঁচ গোত্র।

উপরে যাহা কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হইয়া এথানেই বসবাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ ছিলেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণিগোত্রীয় এবং ছান্দড় বাৎস্যগোত্রীয়।

১১০। গোত্র কি?

সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন, পূর্ব্বে ঋষিরা নানা কার্য্যের জন্য অনেকগুলি করিয়া ধেনু রক্ষা করিতেন। সেগুলির নাম হোমধেনু। তাহাদের রক্ষার ভার শিষ্য ও সন্তানদের উপর অর্পিত হইত। হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমের অনতিদূরে এক একটী গোচারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ঐ স্থানগুলি বৃতি দ্বারা বেষ্টিত থাকিত, সুতরাং হিংস্র বনাজন্তু

* বার্ষিক বসুমতী।

সহসা সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। এই সকল স্থানে গোধন ত্রাণ বা রক্ষা পাইত বলিয়া এগুলির নাম হইল গোত্র। ক্রমে এক স্থলে অনেকগুলি ঋষির "গোত্র" নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন গোত্রের পৃথক পৃথক নামকরণ হয়। তখন সেই সেই ঋষিকে গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিযা ধরা হইল। তাঁহাদের সন্তান বা শিষ্যগণ তাঁহাদের গোত্রসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে গোত্র শব্দে বংশ ও তদ্বংশসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রকে বুঝাইতে লাগিল (১)।

১১১। প্রবর কি?

এদেশের ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের গোত্র বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রবরও উল্লেখ করিতে হয়। প্রবর কি? বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন— ঋষিদিগের মধ্যে ক্রমে যখন নামসাদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন সেই সদৃশনামা ঋষিদিগকে প্রবরের দ্বারা বিশেষিত করা হইতে লাগিল। ঐ সকল ঋষিদিগের সন্তান বা শিষ্যদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন, তাঁহাদিগেরই নামে 'প্রবর' প্রচলিত হইল। এইরূপে 'প্রবর' দ্বারা এক গোত্রে যতগুলি বংশের সংস্রব থাকে, তাহা সহজে উপলব্ধ হয় (২)।

১১২। বেদী কি?

সেকালের কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় লইতে গেলে তাঁহার নাম, গোত্র ও প্রবর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কোন্ বেদী তাহাও জিজ্ঞাসা করা হইত। পুরাকালে কোন ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদ না হৌক, অন্তত একটী বেদেরও কোন এক অংশ না পড়িলে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতেন না। এখনও কোন ব্রাহ্মণের গৃহে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধীত বেদবিহিত প্রণালী অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে "কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা পরিত্যাগপুরঃসর অন্য বেদের বা শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না, এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে অন্য বেদাদির নিয়মানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না" (৩)। যে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ যে বেদবিহিত প্রণালী অনুসারে সাধারণত অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহাকে তৎবেদী বলা যাইত।

১১৩। পঞ্চব্রাহ্মণের কে কোন্ বেদী?

বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের যে বংশধরেরা আছেন, তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই বারেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই রাঢ়ী। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ভেদের কারণ এখন আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামবেদেরই চর্চ্চা অধিক। ইহাঁদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুমশাখী, অর্থাৎ সামবেদের কুথুমশাখাবিহিত প্রণালী অনুসারেই ক্রিয়াকর্ম্ম করেন। যাঁহারা ঋগ্বেদী, তাঁহাদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্ম্ম আশ্বলায়ন শাখার নিয়মে সম্পন্ন হয়। যজুর্ব্বেদীদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্ম্ম কাণ্বশাখার মন্ত্রে সম্পাদিত হয় (৪)। মহেশ তাঁহার কুলপঞ্জিকায় পঞ্চব্রাহ্মণকে সামবেদে লব্ধগৌরব বলিয়াছেন (৫)। কুলার্ণবের বচন ধরিয়া মুলো পঞ্চানন তাঁহার সারাবলী গ্রন্থে বলেন—ভট্টনারায়ণ ও দক্ষ তিন বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন, শ্রীহর্ষ অথর্ব্ববেদে কুশল ছিলেন, চতুর্ব্বেদী ছান্দড় এবং তাঁহার সমতুল্য বেদগর্ভ সামবেদে পারগ ছিলেন (৬)। প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ ও বীতরাগ চতুর্ব্বেদে এবং সুধানিধি, মেধাতিথি ও সৌভরি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন (৭)। আমরা এখানে তাঁহাদের পুত্রগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ধরিতে পারি। গৌড়ে-ব্রাহ্মণপ্রণেতা বলেন যে, যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্য, হোম ও উদ্গান, এই তিন ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুর্ব্বেদী দ্বারা, হোম ঋগ্বেদী দ্বারা, এবং উদ্গান সামবেদী দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার বিধি পূর্ব্ব হইতেই আছে (৮)। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে বলিলেন (৯)—"কান্যকুব্জে সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন-বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন না,

(১) স নি০ ৬১ পৃঃ
(২) স০ নি০ ৬২পৃঃ
(৩) স০ নি০ ৯পৃঃ
(৪) স০ নি০ ২৯পৃঃ
(৫) স০ নি০ ৫০৬পৃঃ
(৬) স০ নি০ ৫০৭পৃঃ
(৭) প্রে০ বি০ ২৬২পৃঃ
(৮) ব্রা০ ব্রা০ ৪৭পৃঃ
(৯) ব্রা০ ব্রা০ ৪৭পৃঃ

সামবেদী ও যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞস্থলে আসিয়াছিলেন" (১০) তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

১১৪। দক্ষের পূর্ব্বপুরুষ।

যে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়। সেই কাশ্যপগোত্রে মহাতপস্বী কৃষ্ণমিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র তমিশ্র; তাঁহার পুত্র ওঙ্কার; তাঁহার পুত্র স্বর্ণ; তাঁহার পুত্র জয়; তাঁহার পুত্র বীতরাগ। ক্ষিতীশ প্রভৃতির সঙ্গে ইনি গৌড়ে গিয়াছিলেন (১১)। প্রেমবিলাসের মতে বীতরাগের সুপণ্ডিত দ্বাদশ পুত্র —সুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র, কৃপানিধি, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীব, হরিহর, বলদেব ও দানব (১২)। কিন্তু হরিমিশ্র ও কুলার্ণবের মতে বীতরাগের চারি পুত্র—সুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি (১৩)। এড়ুমিশ্র ও কুলপঞ্জিকার মতে প্রথম চারি পুত্র সুভদ্রার গর্ভজাত (১৪); বীতরাগের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বিখ্যাত ছিলেন (১৫)। আমাদের অনুমান হয় যে, বীতরাগের পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নাম হরিমিশ্র ও কুলার্ণব কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

১১৫। শ্রীহর্ষের পূর্ব্বপুরুষ।

ভরদ্বাজগোত্রে মেধাতিথির অষ্টাদশ পুত্র—আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত, শ্রীহর্ষ, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গাদাস, রবি, শশী, ধ্রুব, নিকর, প্রতাপ, প্রভাব, গণেশ, ঋক্ষ, এবং বজ্র (১৬)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে মেধাতিথির শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আট পুত্র (১৭)। এড়ুমিশ্র এবং কুলরমার মতে মেধাতিথির পুত্রগণের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছিলেন এবং কয়েকজন "জঘন্য" ছিলেন। বিখ্যাত পুত্রগণের মধ্যে শ্রীহর্ষ "শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমান্য, কবিসভায় সর্ব্বপূজ্য, কৃতী ও তিলকস্বরূপ" ছিলেন (১৮)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, কুলতত্ত্বার্ণব ও হরিমিশ্রকারিকায় কেবল বিশেষ বিখ্যাত পুত্রগই স্থান পাইয়াছেন। মেধাতিথির পিতার নাম ধীর এবং তিনিই পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন (১৯)।

১১৬। বেদগর্ভের পূর্ব্বপুরুষ।

সাবর্ণিগোত্রে সৌভরির রত্নগর্ভ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র (২০)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে সৌভরির চারি পুত্র—বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর (২১)। কুলরমা এবং মহেশ্বরধৃত কুলপঞ্জিকার মতে সৌভরির ৯টী পুত্র (২২)। হরিমিশ্রও কুলতত্ত্বার্ণবের সমর্থন করিয়া চারি পুত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন (২৩)। আমাদের অনুমান হয় ইঁহারা বিশেষ বিখ্যাত চারি পুত্রকেই স্বীকার করিয়াছেন।

১১৭। ছান্দড়ের পূর্ব্বপুরুষ।

বাৎস্যগোত্রে সুধানিধির সাত পুত্র—ধরাধর, হৃষীকেশ, ছান্দড়, বিভূতি, ভূতভাবন, দেব এবং কল্যাণমিত্র (২৪)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে দুই পুত্র —ছান্দড় এবং ধরাধর (২৫)। কুলপঞ্জিকা এবং বাচস্পতিমিশ্রধৃত কুলার্ণবের মতে সুধানিধির প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ছান্দড় ব্যতীত অপর ছয়জন জন্মগ্রহণ করেন, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কেবল ছান্দড় জন্মগ্রহণ করেন (২৬)।

১১৮। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ।

ভট্টনারায়ণের এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় পরবর্ত্তী কথায় আলোচনা করিব।

১১৯। পঞ্চব্রাহ্মণের বয়স।

ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁহাদের বয়স কত ছিল, তাহা মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, কুলপঞ্জিকা (২৭) এবং ভাটের কাহিনীতে (২৮) স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের বয়স ছিল ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর, দক্ষের ৬০ বৎসর এবং বেদগর্ভের ৫০ বৎসর। কেবল ছান্দড় যুবাপুরুষ

(১০) রা॰ ব্রা॰ ৪৭পৃঃ
(১১) ব্রা॰ কা॰ ১০৩ হরিমিশ্র
(১২) প্রে॰ বি॰ ২৬০পৃঃ
(১৩) কু॰ ত॰ ৮৯ শ্লোক, ব্রা॰ কা॰ ১০০পৃঃ
(১৪) স॰ নি॰ ৪৮৪পৃঃ
(১৫) স॰ নি॰ ৪৮৪পৃঃ
(১৬) প্রে॰ বি॰ ২৬০পৃঃ।
(১৭) কু॰ ত॰ ৯০ ও ৯১ শ্লোক।
(১৮) স॰ নি॰ ৪৮৫পৃঃ।

(১৯) স॰ নি॰ ৪৮৩—পৃঃ।
(২০) প্রে॰ বি॰ ২৬০পৃঃ।
(২১) কু॰ ত॰ ৯২ শ্লোক।
(২২) স॰ নি॰ ৪৮০পৃ.।
(২৩) ব্রা॰ কা॰ ১০০পৃঃ।
(২৪) প্রে॰ বি॰ ২৬০পৃঃ। (২৫) কু॰ ত॰ ৯০ শ্লোক।
(২৬) স॰ নি॰ ৪৮২—৮৩।
(২৭) স॰ নি॰ ৫৫৫—৫৬।
(২৮) স॰ নি॰ ৫৫৭।

ছিলেন (২৯)। তাঁহাদের বয়স অধিক হইলেও তাঁহারা অসাধারণ বলশালী ছিলেন। মুলো পঞ্চানন বলেন যে, শ্রীহর্ষ বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট শারীরিক বল ছিল, এমন কি, তাঁহাকে যুবাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত (৩০); তিনি অত্যন্ত কর্ম্মশীল ও ভীষ্মসদৃশ ছিলেন। ভট্টনারায়ণ ৮০ বৎসর বয়স্ক হইলেও সপ্তর্ষির ন্যায় দিবা নিশি জাগ্রত থাকিতেন (৩১)। দক্ষ ৬০ বৎসর বয়স্ক হইলেও মনে ও দেহে ব্রহ্মার বল ধারণ করিতেন (৩২)। বেদগর্ভের বয়স ৫০ হইলেও বীর্য্যে বশিষ্ঠসদৃশ ছিলেন এবং ছান্দড় যুবা হইলেও জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন (৩৩)।

মহর্ষির আত্মজীবনীতে বর্ণিত বাড়ী ও বাগান।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে নানা স্থানে পুরাতন বাড়ী, ভদ্রাসন বাড়ী, বৈঠকখানা বাড়ী ও বেলগাছিয়ার বাগানের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সে সকলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পুরাতন বাড়ী ও 'গোপীনাথ' বিগ্রহ।

[এই অংশ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন।]

"পুরাতন বাটী অর্থে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরগোষ্ঠীর আদি বাসভবন। নীলমণি ঠাকুরের পরিবারে কোনও দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্ত্তমান কালে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাটীতে যে 'রাধাকান্ত' বিগ্রহের পূজা হয়, সেই বিগ্রহই ঠাকুর-বংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। পরে যখন দর্পনারায়ণের পুত্রগণ পৃথক হন, তখন (মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পিতামহ) গোপীমোহন ঠাকুর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নিজ বাটীতে 'গোপীকান্ত' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিগ্রহ এখনও মূলাযোড়ের ঠাকুর বাটীতে বিদ্যমান। 'গোপীনাথ' বলিয়া কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর কোনও বিগ্রহের কথা আমার জানা নাই।

নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমিদারী সেরেস্তার মোহরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

'বঙ্গোত্তরে রঙ্গপুরে পরগণে পাতিলাদহে।
গোপীনাথঃ প্রভুর্যস্য ভূপতিস্তস্য ঠাকুরঃ॥'

উত্তরকালে প্রসন্নকুমারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে বোধ হয় মহর্ষি পুরাতন বাটীর ঠাকুরের নাম ভুলিয়া গিয়া 'রাধাকান্ত' স্থলে 'গোপীনাথ' ব্যবহার করিয়াছেন। মহর্ষি এখানে পুরাতন বাটীর 'রাধাকান্ত' বিগ্রহের কথাই বলিতেছেন, এইরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, গোপীমোহন ঠাকুরের বাটীকে 'আমাদের পুরাতন বাটী' বলা মহর্ষির পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

ভদ্রাসন বাটী।

বর্ত্তমান ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ যে বাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তাহাই দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভদ্রাসন বাটী। কিন্তু এ বাড়ীর অনেক অংশ পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল; ভিতরের দিকে অনেক খোলা জমি ছিল, পুকুর ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাহা দেখিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতিতে আছে,— "বাহির বাড়ীতে দোতালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। ... জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। ... তাহার [বট গাছের] গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ... বাড়ীর ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল, তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশী বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতী আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সম্পত্তি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। ... আমাদের বাড়ীর উত্তর অংশে আর একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত।" ('জীবনস্মৃতি', শান্তিনিকেতন প্রেস, ৯-১৫ পৃষ্ঠা।)

বাড়ীর ভিতরে আর একটি পুকুর ছিল। একটি বালক (রামবল্লভ ঠাকুরের পুত্র) ডুবিয়া মারা যাওয়াতে সে পুকুর বুজাইয়া ফেলা হয়। আত্মজীবনীর ২০, ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "তত্ত্বরঞ্জিনী" সভার অধিবেশন বাহির বাড়ীর পুকুরের ধারের কোনও কুঠরীতে হইয়া থাকিবে। সেই পুকুর বুজাইয়া এখন ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ভবনের দক্ষিণের বাগান হইয়াছে।

---

(২৯) স° সি° ৫৫৬—৫৭।
(৩০) স° সি° ৫৫৫পৃঃ।
(৩১) স° সি° ৫৫৬পৃঃ।
(৩২) স° সি ৫৫৬। (৩৩) স° সি° ৫৫৬পৃঃ।

বেলগাছিয়ার বাগান।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ বাগান বর্ত্তমান কালে পাইকপাড়ার রাজাদের অধিকারে আছে। ইহা বেলগাছিয়া রোডে অবস্থিত।

১৮২৩ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বের আঠারো উনিশ বৎসর কাল দ্বারকানাথের সম্পদ ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। উচ্চপদস্থ দেশীয় ও ইংরাজ উভয়শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সকল লোককে 'বেলগাছিয়া ভিলায়' প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যেও দ্বারকানাথের এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, এই বেলগাছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তাঁহার সাহায্যে নিজ চাকরী প্রভৃতির সুবিধা করিয়া লইতেন। "তখনকার দিনে 'বেলগাছিয়া ভিলা'র নিমন্ত্রণ হয় না, বা দ্বারকানাথের সহিত পরিচিত নহেন, এ কথা বলিতে যেন সাহেবেরা মর্য্যাদার হানি মনে করিতেন"। (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩৩০, ৩৩১)।

দ্বারকানাথের চরিতাখ্যায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিতেছেন, "দ্বারকানাথ 'বেলগাছিয়া ভিলাকে' সূক্ষ্ম সুরুচির সহিত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এই ভিলাই তাঁহার আতিথ্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। এখানে তিনি রাজার মতন খরচ করিয়া নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করিতেন। 'মোতি ঝিল' নামক একটি খাল সমস্ত বাগানটির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রসারিত ছিল; এই ঝিল নীলপদ্ম রক্তপদ্ম এবং অন্যান্য নানা ফুলে সর্ব্বদা ঝলমল করিত। চারিদিকে বাগানের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরটি বিস্তৃত; ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহা গোলাপ ফুলে এবং অন্যান্য নানাবর্ণের ফুলে সুশোভিত থাকিত। বাগানে একটি সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর ছিল। তাহা তখনকার পক্ষে নূতন প্রণালীতে সজ্জিত করা হইয়াছিল। নব্যতন্ত্রের য়ুরোপীয় শিল্পিদিগের ভাল ভাল ছবিতে গ্যালারির দেওয়ালগুলি অলঙ্কৃত ছিল। দ্বারকানাথ ছবির ও প্রস্তরমূর্ত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। বৈঠকখানার পশ্চাতে একটি মার্ব্বল পাথরের ফোয়ারা ছিল। মোতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ; দ্বীপের উপরে একটি "summer house"; তাহাতে যাইবার জন্য একটি কাঠের সেতু ও একটি ঝুলানো লোহার সেতু ছিল। এইটি বিশেষভাবে আমোদ-প্রমোদের স্থান ছিল।

দ্বারকানাথ প্রায়ই তাঁহার এই বেলগাছিয়া ভিলাতে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের ভোজ দিতেন। ভোজের প্রাচুর্য্যে ও নিমন্ত্রিতদের পদমর্য্যাদায় এই সকল ভোজের দিনগুলি তৎকালীন কলিকাতার ইতিহাসে এক-একটি চিহ্নিত দিন হইয়া উঠিত।

এই সকল ভোজে সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই দ্বারকানাথ নিমন্ত্রণ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে একত্র করিয়া, তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ও মন খুলিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ সৃষ্ট করিয়া দিতে, দ্বারকানাথ অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। সরকারী দরবার প্রভৃতিতে দেশীয় ও য়ুরোপীয়গণ একত্র মিলিত হইতেন বটে; কিন্তু পদের অনৈক্য ভুলিয়া সমানভাবে বন্ধুর মতন মিশিবার স্থান একমাত্র বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল। স্বয়ং দ্বারকানাথ মানুষটি এমন ছিলেন যে, তাঁহার গুণেই এই সকল মিলনের ব্যাপার এমন সফল হইয়া উঠিত। তাঁহার মধুর ব্যবহারে, সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেন।

এই বেলগাছিয়া ভিলা'তে দ্বারকানাথ একদিন অনারেব্‌ল্ মিস্ ইডেনের সম্মানার্থ একটি নাচ এবং সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান করেন। মিস্ ইডেন লাট-ভগিনী, অতএব য়ুরোপীয় সমাজের অধিনেত্রী, এবং দ্বারকানাথ বাঙ্গালীসমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ; অনুষ্ঠানটি এই নিমন্ত্রিতা ও নিমন্ত্রণকারী উভয়েরই পদমর্য্যাদার অনুরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ঘরগুলি আলোকে, আরশীতে, মির্জ্জাপুরের কার্পেটে, লাল ভাজিমে, সবুজ রেশমে, পুষ্পগুচ্ছশোভিত মার্ব্বেলের টেবিলে, দর্শকদিগের চোখ ঝলসাইয়া দিতেছিল। সিঁড়িতে, বারান্দায়, হলে, অজস্র নানা জাতীয় অর্কিড, সুদৃশ্য লতা, ও পাতাবাহারের গাছ রক্ষিত হইয়াছিল। Summer houseটি এবং ঝুলানো সেতুটি, ফুল, লতা ও দেবদারুপাতার মালায় এবং নানা বর্ণের পতাকায় ভূষিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র রঙীন আলোতে জল ও স্থল উদ্ভাসিত হইতেছিল। হলের ভিতরে অবিশ্রাম বাজনা বাজিতেছিল; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরও নাচ চলিতেছিল; বাহিরে ঘন ঘন বিচিত্র জমকাল আতসবাজি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সকলেই বলিতেছিলেন যে এমন জাঁকজমকের ভোজ কলিকাতায় কখনও দেখা যায় নাই।*

কিন্তু শ্রেষ্ঠভাবে বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে ইহা কেবল একটি বড় ভোজ নয়; ইহা দেশের সামাজিক ইতিহাসেরও একটি বড় ঘটনা। দ্বারকানাথ ইংরেজসমাজ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কতরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, এই ঘটনা

* *Calcutta Courier* পত্রিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এই ভোজের উল্লেখ আছে। তৎপূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই ভোজ হইয়াছিল।—(প্রবন্ধলেখক)।

তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।"—(Mem. 70—74; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

লর্ড অক্‌লণ্ডের ভগিনীর এই সম্বর্দ্ধনার বৃত্তান্ত আত্মজীবনীর ৩২পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর দেশীয় ও য়ুরোপীয় ভদ্রলোকদিগকে সামাজিক ভাবে মিলিত করিবার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার চিত্র উপরে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে তখন দেবেন্দ্রনাথের একটুকুও উৎসাহ ছিল না। ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই সকল প্রমোদসভার কার্য্যকলাপ দেবেন্দ্রনাথের রুচি ও প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজের সামাজিক মিলন সংঘটন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় পরবর্ত্তী কালেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই।

দ্বারকানাথের চেষ্টা ও প্রভাব সত্ত্বেও তৎকালীন হিন্দু ভদ্রলোকদের পক্ষে য়ুরোপীয়দিগের সহিত আহার করা সহজ ছিল না। ১৮৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলগাছিয়ার বাগানে একটী জমকাল ball নাচ ও ভোজ হয়। যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক নাচ ও বাজি পোড়ান দেখিয়াই চলিয়া গেলেন, খানার টেবিলে বসিলেন না, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া *Bengal Hurkaru* পত্রিকা (২১শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায়) লিখিতেছেন, "There were a great many native gentlemen present on the occasion. Many of them remained to witness the exhibition of the fireworks only, and then returned, no doubt to escape the steam of the supper table." অপর দিকে, যাঁহারা সেখানে গোপনে খানা খাইয়া আসিতেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বাংলা কাগজে ছড়া বাহির হইয়াছিল,—

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।'

("প্রবাসী", ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ২৩২পৃষ্ঠা, সৌদামিনী দেবী লিখিত "পিতৃস্মৃতি" দ্রষ্টব্য)।

বৈঠকখানা বাড়ী।

বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই বেলগাছিয়ার বাগানে দ্বারকানাথ এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত আহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার ফলে তাঁহাকে নিজ ভবনের এ কাংশে "বৈঠকখানা বাড়ী" নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর নানা স্থানে এই বৈঠকখানা বাড়ীর উল্লেখ আছে।

"দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ হোম, তর্পণ, জপ করিতেন। অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহের নিত্য পূজা করিতেন। যে পূজক নিযুক্ত ছিল সে ভোগাদি পাক করিয়া ভোগ দিত ও আরত্রিক করিত। ... ... তাহার পর যখন সাহেব মেমদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, তাঁহার বেলগেছিয়ার বাগানে খানা চলিতে লাগিল, তখন প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ খানার টেবিলে বসিতেন না; দূরে দূরে থাকিতেন, এবং খানার শেষে গঙ্গাজলাদি স্পর্শ ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতেন। যতদিন এইভাবে চলিয়াছিল, ততদিন তিনি নিজে দেবপূজা করিতেন। কিন্তু যেদিন হইতে তিনি মেম [ও] সাহেবদিগের প্ররোচনায় তাঁহাদের সহিত ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হইলেন, সেই দিন হইতে নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন এবং নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাজের জন্য,—অর্থাৎ পূজা, হোম, তর্পণ, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য,—ভিন্ন ভিন্ন বেতনভূক্ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শুনা যায়, তাঁহার এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ১৮ জন ছিল।

এই সময় হইতে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন না, পূজা-পার্ব্বণে ঠাকুরদালানে উঠিতেন না, সাধারণ দর্শকের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া দেবদেবী দর্শন করিয়া প্রণামাদি করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণ, এমন কি তাঁহার পত্নীও, তাঁহার সহিত একাসনে বসিতেন না; হঠাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। এই সময়ে দ্বারকানাথের জ্ঞাতিগণ তাঁহার ভ্রষ্টাচারজন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরবংশীয় হরকুমার, কানাইলাল প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ইহা অবগত হইয়া তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসনের পার্শ্বে এক বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন, এবং এই নূতন বাড়ীতেই থাকিতেন।...

তাহার পর যখন দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত যান, তখন পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতা কানাইলাল ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'আর চলিবে না, এইবার আমরা বাধ্য হইয়া তোমায় ত্যাগ করিব।'... প্রথম যাত্রায় দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার এক ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন। এই যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে দ্বারকানাথ তাঁহার ভদ্রাসন হইতে স্বতন্ত্র বৈঠকখানায় বাস করিলেন; এবং তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার জ্যেষ্ঠের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাসের জন্য

বাহির মহলের বৈঠকখানার উপরে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইল, তাঁহার আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল।" (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩৪৯—৩৫১ পৃষ্ঠা ও সংশোধন-পত্র দ্রষ্টব্য।)

এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ যে বাড়ীতে এখন দ্বারকানাথের পুত্র গিরীন্দ্রনাথের বংশধর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বাস করিতেছেন, সেই বাড়ীই দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠক-খানা বাড়ী ছিল।

ধর্ম্মসাধনে কর্ম্মের আবশ্যকতা।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনে এত অন্তরায় যে, মানুষ মনে করে, সংসার ছাড়িয়া না গেলে কিছুই করা যাইতে পারে না; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া যদি নির্জ্জনে যাইতে পারি তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন-ভজনে মন দেওয়া যাইতে পারে, এই বলিয়া কত সাধু বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে এইরূপ অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কত কারণে এই বিরক্তি আসে—কেহ হয়ত এত দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন যে, আর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; কাহাকেও মানুষের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য সংসারবিমুখ করিয়াছে; আবার কেহ কেহ অদৃশ্য ও অজ্ঞাত বস্তুর মধুর আকর্ষণে সংসারের সুখ-দুঃখকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কাহার মনের ভিতর কখন্ কি স্রোত আসিয়া আঘাত করে তাহা বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে প্রকৃতির সমস্ত আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে, বাহিরের সমস্ত রূপ রস গন্ধ তুচ্ছ করে একেবারে অনির্ব্বচনীয় ভূমার শুদ্ধ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন এরূপ যোগীর সংখ্যা বিরল।

শাক্যসিংহ গৌতম রোগ মৃত্যু জরা বার্দ্ধক্য দেখে সংসার ছাড়লেন, নিজের জীবনে কিছুই আঘাত পাননি। তাঁর পিতা তাঁকে খুব সুখের মধ্যেই রেখেছিলেন। কিন্তু এত সুখের মধ্যে থেকেও সংসারের দুঃখের রূপ তাঁর সামনে যখন এসে পড়ল তখন তিনি সমস্ত দুঃখের অতীত হওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। সংসার পরিত্যাগ করে—কৃচ্ছ্র সাধনা আরম্ভ করলেন। সাত বছর ধরে কঠোর সাধনা করে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে পারলেন না। মানবপ্রকৃতি তাঁর সমস্ত সাধনাকে যেন বিদ্রূপ করে উঠল। শরীর শুষ্ক হয়ে গেল—অস্থি-চর্ম্মসার হল, দুর্ব্বল হয়ে অজ্ঞান হতে লাগলেন, সহ-সাধকেরা পরিত্যাগ করে গেলেন, কিন্তু তাঁর শান্তি এল না; প্রাণে সে আলোক এলো না, যার বলে তিনি বলতে পারেন যে, সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তার পরে যখন কৃচ্ছ্র সাধন পরিত্যাগ করলেন, মানুষের হৃদয়ে প্রেমের পরিচয় পেলেন, সহসা তাঁর মধ্যে নূতন আলোক এল। এই আলোক তাঁকে নিয়ে গেল কর্ম্মের দিকে, জীবের প্রতি প্রেমে; প্রকৃতির শক্তিকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করে, জীবনে নূতন শক্তি লাভ করলেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তিনি সংসারে ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করলেন। মানুষকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের দিকে তিনি আহ্বান করলেন। সেই আহ্বান শুনে কত নর-নারী ধন্য হয়ে গেলেন। কর্ম্মের নূতন ধারার মধ্যে মানুষ কি এক আনন্দ পায়! সে আনন্দ নিজের সুখ-জনিত নয়—তাতে জীবনের সমস্ত শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। একটি পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, তার মধ্যে কত আনন্দ! সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই পুষ্পজীবনের সার্থকতা। মানুষ যদি আজীবন কাজ করে যেতে পারে, সদ্ভাবে যদি সে সমাজের ও জীবের মঙ্গলের জন্য জীবন দান করতে পারে, তবে উহা অপেক্ষা মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়?

> ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

"কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; এবং কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না।"

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞান লাভ করা যায় না, ইহার কারণ কি? আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে সিদ্ধি পাইব না। ইহা বড় শক্ত কথা। তত্ত্বদর্শীরা এই কথার প্রমাণ দিয়াছেন; গীতায় তাই আবার বলা হইয়াছে, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ-গুণৈঃ॥" "কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, স্বাভাবিক গুণে সকলে অভিভূত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে।" যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। অনেকে হয়ত কার্য্য করিতেছে না, কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ইচ্ছা খুব বেশী; সেইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কপটাচারী, তিনি গৈরিক ধারণ করুন বা ভস্মে দেহ আবৃত করুন তাঁহার হৃদয় সাধারণ মানুষের মত দীন। বাহিরের কর্ম্মবিমুখতা তার একটা মিথ্যা আবরণ, সংসারে এইরূপ কপটাচারীর সংখ্যা অনেক।

বাহিরে বলিয়া বেড়াই—ধর্ম্মে আমার জীবনকে অর্পণ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারি নাই, আমার পবিত্রতা লাভ হয় নাই, আমার সমস্ত সাধন-ভজন বৃথা।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

"হে অর্জ্জুন, কিন্তু যিনি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই ফলকামনাহীন অনাসক্ত ব্যক্তিই প্রশংসার যোগ্য।" এইরূপ কাজ ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য বা কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া নয়; তবে কিসের জন্য মানুষ কর্ম্ম করিবে? নদী পর্ব্বতগাত্র হইতে নির্গত হইয়া যদি আপনার জলধারা সমস্ত সমতলে ছড়াইয়া দিত, তাহা হইলে সমুদায় জল শুকাইয়া যাইতে বিলম্ব হইত না; কিন্তু সেই জল গভীর খাতের মধ্য দিয়া যায় বলিয়া সংসারের এত উপকার হয়। সেইরূপ মানুষের প্রকৃতিকে সংযত না করিলে মানুষ উচ্ছেদের দিকে যায়। নদী আপনার জল রক্ষা করিতে পারে তাহাকে কুল দিয়া বাঁধা হয় বলিয়া। মানুষের শক্তি এইরূপ বাঁধন চায়। বুদ্ধ এই পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন; গীতায়ও তাই বলা হচ্ছে, মন দ্বারা ইন্দ্রিয়চয় নিয়মিত করে কার্য্য করতে। কার্য্যে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার শিক্ষা—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

"তুমি নিত্য কর্ম্ম কর, যেহেতু কর্ম্মহীন অবস্থা অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।"

ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কর্ম্মের ভেরীধ্বনি শুনিয়া মানুষ কি করিয়া ইহাকে তুচ্ছ বলিয়া চলিয়া যায় তাই অনেক সময় ভাবি। ঘোর সংশয়সংগ্রামের মধ্যে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"তুমি কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।" অথচ ভারতবাসীর মন সর্ব্বদা কর্ম্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল, ইহা একটা রহস্য। কর্ম্ম কিসের জন্য করবে? শরীরটা শুকিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে;—

যজ্ঞার্থং কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

"যদি লোকে যজ্ঞ বা ভগবদারাধনার্থ ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম বন্ধন হয়, সুতরাং হে কৌন্তেয়, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।" আমি কাজ করিব যাহা যজ্ঞ, তাহা আমার ভগবানের আরাধনা, ইহাতে আর অন্য আকাংক্ষা নাই। আমার সব কাজ তাঁর পূজা, ইহা অপেক্ষা মানুষ আর কি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিতে পারে? আমার শরীর ও মন দিয়ে ভগবানের সেবা হতে পারে এই বিশ্বাস করলে সমস্ত কর্ম্মকুণ্ঠা লোপ পায়। আমার হাত দিয়ে দেবযজ্ঞ সম্পাদিত হবে এবং সেই যজ্ঞে নরকুল ধন্য হবে, জগতে দেবভাব প্রসারিত হবে, এইরূপ কর্ম্মের আকর্ষণে পড়লে মানুষের সমস্ত দোষ-দুর্ব্বলতা পালিয়ে যায়, কাজ তাকে মুক্তির নির্ম্মল আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

"এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন, এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিতে করিতে পরম মঙ্গল লাভ করিবে।" মঙ্গল ও পবিত্র কার্য্যে জীবনের সমস্ত দেবভাব উদ্বুদ্ধ হয়, এবং দেবভাব উদ্বুদ্ধ হলে জীবন উন্নতির পথে যায়। ভগবানের সেবায় যদি কেহ জীবন অর্পণ না করে, তাহা হইলে সে যাহা কিছু সম্ভোগ করে তাহাতে তাহার অধিকার নাই; এইরূপ সুখান্বেষী লোককে চোরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মের উৎস স্বয়ং ভগবান। তিনি নিজে খাটিতেছেন, অতন্দ্রিতভাবে সমুদায় সৃষ্টি করিতেছেন; তাঁর কাছে দিন নাই, রাত্রি নাই, কত কোটি কোটি সৌরজগত নির্ম্মাণ করছেন, কত রক্ষা করছেন, কত গড়ছেন, কত সাজাচ্ছেন, স্বয়ং আদর্শ হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ক্রিয়াশীল দেবতা আমাদিগকে কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন করেছেন, আমরা কিছুই করছি না। অহঙ্কারে অন্ধ ব্যক্তিরাই বলতে চায় যে "আমি কর্ম্মের কর্তা"। একটু অভিনিবেশ সহ দেখলে বুঝতে পারি আমি কিছুই করি না, যা কিছু করি সে কেবল ভগবদ্দত্ত শক্তির গুণে। আমি নিজে কিছু করছি না, ভগবানের জন্যই সমস্ত কাজ, এই বিশ্বাস করে যাঁরা কর্ম্ম করেন, তাঁরা কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি লাভ করেন, তাঁরা সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণার হাত হতে অনায়াসে ত্রাণ পেতে পারেন। এই বিশ্বাস না হলে কর্ম্ম আমাদের বন্ধন, আমাদের ক্রমে জড়িয়ে মেরে ফেলে। কেবল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ফলালে আমরা ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে পার পেতে পারি না, আমি সহজে রাগ-দ্বেষে বিচলিত হতে পারি। ঈশা যখন বন্দী হয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পেলেন, তিনি অবিচলিত হয়ে বললেন, ইহাই আমার পিতার ইচ্ছা! হৃদয়ে কি শান্তি! কোন উদ্বেগ নাই, সমস্ত জীবন তিনি ভগবানকে আহুতি দিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর আবার কিসের ভয়? সমস্ত সংসার উল্টে গেলেও তাঁর সেই জীবনের কার্য্য তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। সেই যজ্ঞে ভগবানে

তৃপ্ত হলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকার কত বেড়ে গেল, স্বর্গ মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হল। নিষ্কাম আত্মযজ্ঞের ইহাই রীতি। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে বুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হলেন, সংসারে নূতন প্রেমের ধারা প্রবাহিত হল, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে গভীর সখ্য সংস্থাপিত হল। তাঁর পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন সন্তুষ্ট হলেন, ভারতের নরনারী শান্তির মন্ত্র পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।

ধর্ম্মসাধনের জন্য কর্ম্ম মানবের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অদম্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করতে হলে তাহাদিগকে সৎ কার্য্যে নিযুক্ত করতে হয়। সেই কার্য্যের মধ্যে তারা আপনাদের শক্তিকে খাটিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, মন ধর্ম্মপথ হতে আর দূরে চলে যেতে পারে না। ইন্দ্রিয়দমন অতি কঠিন কার্য্য। তারা সহজে বশ মানতে চায় না, অনেক সময় বিপথে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার মনে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে ভগবানের কাছে যাওয়া, যদি আমার জীবনকে তাঁর যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করতে কৃতসংকল্প হই, তাহলে বিপথে গেলেও আমার গম্যস্থানে এক সময় না এক সময় গিয়ে পড়বই। চুপ করে বসে থাকলে রিপু অনেক সময় আরও প্রবল হয়ে ওঠে। তাকে ভাল কাজে খাটিয়ে জব্দ করতে হবে; তাই কর্ম্ম আমাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তিনি আমাদের যে কর্ম্মশক্তি দিয়েছেন তার দ্বারা যেন আমরা তাঁকে পেতে পারি।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

অক্সফোর্ড বেলায়ল কলেজের ডাক্তার স্কট কবি টেনিসনের বন্ধু ছিলেন। কবি অতিথিরূপে সময়ে সময়ে তাঁহার ভবনে সমাগত হইতেন, কিন্তু ডাক্তার স্কটের কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁহার কবিজন-সুলভ চিত্তের পক্ষে প্রীতিকর না হওয়ায় তিনি উদারচেতা কাউয়েলের বাসভবনকেই বিশেষ পছন্দ করিতেন। এই সূত্রে কবির সহিত কাউয়েলের প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়। সুবিখ্যাত লেখক থ্যাকারে সাহেবের সহিতও কাউয়েল এই সময়ে পরিচিত হন। *

অক্সফোর্ডে আগমনাবধি কাউয়েল বরাবরই Honours School এ যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কখনও 'পাশ' এবং কখনও 'অনার্স' স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া তিনি আপনার প্রাথমিক দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন। অবশেষে মতি স্থির করিয়া তিনি Honours School এই অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতেই উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতিরিক্ত বাজে বই পড়ার জন্য বন্ধুবর্গ তাঁহার সফলতাবিষয়ে হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার আশাতীত কৃতকার্য্যতা সকলের পক্ষেই যে প্রীতিকর হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি Honours Course ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন, তথাপি তাঁহার প্রত্যুত্তর পত্র পরীক্ষকগণের এতদূর প্রীতিকর হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলে একযোগে তাঁহাকে সম্মানীয় চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়া বি-এ, উপাধিতে ভূষিত করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া * দশ পাউণ্ড মূল্যের কতকগুলি পুস্তক উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে হিব্রু ভাষায় বৃত্তিলাভের চেষ্টা করিতে গিয়া ভালরূপ প্রস্তুত না থাকায় অকৃতকার্য্য হন।

কাউয়েলের ভাগ্যে অক্সফোর্ডে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁহার বন্ধু জর্জ্জ কিচেন তাঁহাকে একটী পত্র লিখিয়া জানান যে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী ইতিহাসাধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায় সার জেমস্ ষ্টিফেন তাঁহাকে ভারতবর্ষে যাইয়া উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সক্ষম এমন কোন একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন কলেজে

* কলিকাতা মহানগরী থ্যাকারের জন্মস্থান। তাঁহার একটী আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-ভবনে রক্ষিত আছে।

* কাউয়েলের জীবনচরিতের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে … … 'he took his M. A. degree in 1857 before his departure for India'; কিন্তু ১২১পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'on August 1st they both sailed for India' … এবং কলিকাতায় আসিয়া কাউয়েল যে চিঠি লিখেন তাহার তারিখ 'Dec. 7-56 Monday, Spence's Hotel, Calcutta.' সুতরাং কোন্ বৎসর তিনি ঠিক্ এম এ. পাশ করেন তাহা বোঝা গেল না।

অধ্যাপকের পদ লাভ করা কাউয়েলের পক্ষে স্বপ্নাতীত সুযোগ বলিয়া মনে হইল। যদিও ইংলণ্ডের ইতিহাস তাঁহার যথার্থ পাঠ্য বিষয় ছিল না, তবুও বিষয়টি তাঁহার প্রিয় ছিল। উক্ত পত্র প্রাপ্তির তিন মাস পরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রাজনীতিমূলক অর্থনীতি (political economics) শাস্ত্রদ্বয়ের অধ্যাপকপদের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কাউয়েল ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের যাবতীয় পুস্তকাদি লইয়া ভারতগমনার্থ পোতারোহণ করিলেন। জাহাজে তাঁহারা ব্যবহারোপযোগী ভারতীয় ভাষাশিক্ষায় এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি চর্চ্চায় কালযাপন করিতেন। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ২৯শে নভেম্বর তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এখানকার Spence's Hotelএ বাসস্থান ঠিক করিয়া তিনি আপনার কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার কার্য্যগ্রহণের প্রথম দিনকার একটী ঘটনা পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ দিন কার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া কাউয়েল রায়মহাশয়দিগের ক্লাসের বাহিরে টুপীহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। Mr. Hand তখন অধ্যাপনা করিতেছিলেন, তিনি ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কাউয়েলকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকে তদানীন্তন অধ্যক্ষ Mr. Clintএর নিকট লইয়া গেলেন। এদিকে ছাত্রমহলে তাঁহার নাম প্রচারিত হইবামাত্র ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঐ দিনই অন্য সময়ে Mr. Clint তাঁহাকে লইয়া পুনরায় ঐ ক্লাসে উপস্থিত হইলেন এবং ছাত্রদিগকে একটা অঙ্ক দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইবামাত্র কাউয়েল তখনই সেই সুকঠিন অঙ্কটির সমাধান করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন; ইহাতে Mr. Clint পরে ছাত্রমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেবল সাহিত্যশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত নহেন, পরন্তু একজন যথার্থ গণিতজ্ঞ। এই সময়ে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট লিখিত তৎকালীন পত্রগুলি উক্ত বিদ্রোহবিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদত্যাগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। কাউয়েল সাহেবকে উক্ত পদ প্রদান করিবার একমাত্র আপত্তি ছিল তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞতা। এই জন্য তিনি অভিনিবিষ্ট হইয়া বাঙ্গলা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই উহা আয়ত্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তিনি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অবস্থা ও অধ্যয়নাদিবিষয়ক একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া অস্থায়ী ভাবে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদ গ্রহণ করা হেতু প্রেসিডেন্সি কলেজের পারিশ্রমিক ব্যতীত অতিরিক্ত তিনশত মুদ্রা তাঁহাকে প্রদত্ত হইত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকগণ সেই সময় নিম্ন ও উচ্চ নামক দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর অধ্যাপকগণ মাসিক তিনশত মুদ্রা পারিশ্রমিক এবং বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত অশীতি মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকগণের মাসিক পারিশ্রমিক ছিল ছয়শত টাকা ও বাসস্থানের জন্য একশত। কাউয়েল সাহেব পারিশ্রমিক বাবদ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে মাসিক আটশত টাকা পাইতেন। ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছাড়াও সময়ে সময়ে তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনবিষয়ক অধ্যাপনাও করিতে হইত। প্রতি রবিবার তিনি নিজ ভবনে কয়েকটী ছাত্রকে বাইবেল পড়াইতেন। তিনি ভারতে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে এম এ. পড়িবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনিই প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ. পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেই ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল না। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে উহা প্রবেশিকা, এফ-এ এবং বি-এ, পরীক্ষার পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় এম-এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তনও তাঁহার বিশেষ প্রচেষ্টার ফল; কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি (Vice Chairman)

স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভাষাতেই প্রথম এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন হইয়াই কাউয়েল সাহেব উহার তাৎকালিক অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই একটী সুবিস্তৃত বিবরণ সরকার বাহাদুরকে প্রেরণ করেন। তাঁহার এই সময়কার একটী পত্রে জানা যায় যে সংস্কৃত-কলেজ সম্বন্ধে উক্ত সুন্দর ও সুবিস্তৃত বিবরণী (report) প্রদান করা হেতু তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর তদীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী দ্বারা শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়কে লিখিত একটী পত্রে তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইতে অনুরোধ করেন। কাউয়েলপ্রদত্ত উক্ত বিবরণী অনুসারেই সংস্কৃতকলেজের তাৎকালিক পরিবর্ত্তন সমূহ সংঘটিত হয়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের বিবরণীতেও আমরা উহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই। নিম্নে পাদটীকায় সাধারণের অবগতির জন্য কাউয়েলের জীবনী হইতে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।*

কাউয়েল সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির ইংলণ্ডের ইতিহাস, দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ ভাষার পুস্তকসমূহ নির্ব্বাচনের জন্য একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তৎকালীন The Vernacular Literature Society নামক একসমিতির তিনি সম্পাদক ছিলেন।

* A complete account of the present condition and recent history of the Sanskrit College is given in the valuable report of the Principal, Mr. Cowell. I have nothing to add to Mr. Cowell's statements except to record my opinion that the Institution is now in a most satisfactory state, and that this is mainly due to his tact and judgement, and to the earnest devotion he has bestowed upon a charge for which he is specially qualified by his University training and his eminent acquirements as an oriental scholar. (Life of Professor Cowell—Page 219)

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তিনি Asiatic Societyর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক সমূহের সম্পাদকতা করিবার জন্য তিনি উক্ত সোসাইটির Philological Section এর সভাপতি-পদ লাভ করেন। এই সোসাইটীর জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কাউয়েল-পত্নী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও শুশ্রূষায় শীঘ্রই নিরাময় হইয়া উঠিতে সমর্থ হন। এই সময় কলিকাতার তদানীন্তন বিশপ কাউয়েলকে তদীয় প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করায় তিনি সেইখানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের পক্ষে এই বাড়ীটী বিশেষ উপযোগী প্রতিপন্ন হইল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে তিনি স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

শীঘ্রই বেথুন কলেজের এক সভায় তিনি "History and Historical evidence to the Educated Hindus" নামক বিখ্যাত বক্তৃতাটী প্রদান করেন। এই সময় তিনি কাজে এতদূর ব্যস্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই প্রাতর্ভোজন করিতে বিস্মৃত হইতেন এবং তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্যগুলি চতুর বায়সকুল বণ্টন করিয়া খাইত। এই সময়কার সংস্কৃতকলেজের কোন বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভায় তিনি একটী স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন ও একটী সুদীর্ঘ বাঙ্গলা বক্তৃতা দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টি বিধান করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পুরস্কারবিতরণী সভাতেও তিনি ঐরূপ একটী শ্লোক পাঠ ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

শব্দ-ব্রহ্ম।

(২)

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

এই শব্দ—এই বাণী অপরের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর চাহে। ব্রহ্ম বলিলেন "আমি আছি"—জানি না কোন্ অলক্ষিত শক্তিতে জীবের মুখ হইতেও বাহির হইল "তুমি আছ"। এই "আমি-তুমিতে"

মিলিয়া কত নব নব লীলা-খেলা হইয়াছে ও হইতেছে। এই "আমি-তুমির" সংমিশ্রণে কত হাসি কত রোদন, কত আনন্দ কত বেদন, কত মিলন কত বিরহের সৃষ্টি হইল। ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন "ভগবন্! কোথায় তুমি?" মধুবন মাতাইয়া শত ফুল ফুটাইয়া উত্তর আসিল "বৎস! বৎস! এই যে আমি"। জ্ঞান-হীন দুর্ব্বল ক্ষুধিত তৃষিত শিশু অতি কষ্টে ডাকিল "মা" "মা"—শত কর্ম্ম ফেলিয়া অঞ্চল লুটাইয়া ব্যাকুল হইয়া উন্মাদিনী মাতা ছুটিয়া আসিয়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া শত চুম্বন দিয়া বলিলেন "বাছা! বাছা! এই যে আমি"। ডাকিলেই উত্তর আসে—প্রার্থনা করিলেই ফল লাভ হয়। বসন্তের কোকিল ঝঙ্কার করিয়া যেমন বনান্তর হইতে অন্য কোকিলকে জাগাইয়া দেয়—তেমনই প্রেমিকের কণ্ঠস্বর—প্রেমভরা আহ্বান ধ্বনি—পর্ব্বতসম বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া প্রেমাস্পদকে যত দূরস্থই কেন হউক না—নিকটে—অতি নিকটে ডাকিয়া আনে। মানব যদি নীরব থাকিত, প্রেমভরে ব্যাকুলচিত্তে না ডাকিত—ভগবান তা হলে মনের দুঃখে বোধ হয় সমস্ত সৃষ্টিটাকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। অভ্রভেদী চিরতুহিনাচ্ছন্ন অচল অটল হিমাচল ডাকিতে জানে না বলিয়াই এত বড় হইয়াও জড় পদার্থ মাত্র। অনন্ত গগনবিহারী কোটী চন্দ্র-সূর্য্য এত জ্যোতির্ম্ময় হইয়াও ডাকিতে জানে না বলিয়াই যেন চিরদিন আপনাদের তেজে আপনারা জ্বলিতেছে। মানবশিশু ধন্য যে জন্মদাতাকে ডাকিতে জানে—প্রেমাস্পদের কর্ণে প্রেমগাথা শুনাইতে জানে এবং জীবনধনের মধুমাখা নাম গাহিতে গাহিতে প্রাণ জাগিতে জানে। তাই সে ক্ষুদ্র হইয়াও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাই সে দুর্ব্বল হইয়াও মহাবল পরাক্রান্ত, তাই সে জীব হইয়াও ভগবানের সঙ্গী—যন্ত্রীর যন্ত্র ও স্বর্গের অধিকারী। ডাকা দুর্ব্বলতা নহে—প্রার্থনা করা তোষামোদ নহে—ব্যাকুলতা নিরাশ্রয়তা নহে। যে বিপদে চীৎকার করিয়া বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে পারে—যে সম্পদে কলকণ্ঠ ছাড়িয়া সম্পদদাতার জয়গান করিতে পারে—যে মিলনে আত্মহারা হইয়া পরমাত্মার আরাধনা করিতে পারে এবং যে বিরহে পাগলপ্রাণে গান গাহিয়া ত্রিভুবনকে তন্ময় দেখিতে পারে—সেই মানবই এই বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আধার—সেই মানবই এই সৃষ্টির চিরশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং সেই মানবই যুগে যুগে ধর্ম্মলীলার প্রধান সহায়।

কত প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কত পুরাতন ভগ্ন দেবমন্দিরাদির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডে কোন্ ভাষায় কত কি লেখা আছে তাহা পড়িয়া বেড়াইতেছেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছি—ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে কি সুমিষ্ট দেবভাষায় কি মধুর অনুষ্টুপ ছন্দে কোন্ অনাদি কাল হইতে কত কি লেখা রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে প্রতি ভূতে ভূতে লেখা রহিয়াছে—"ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" কে লিখিয়া গেল—কোন্ যুগে লিখিল—হিন্দু না মুসলমান—খৃষ্ট-পূর্ব্বে না খৃষ্ট-পরে? কেবল মানব কেন—পশুপক্ষীরাও যে কথা কহিতেছে—বৃক্ষলতা যে বেদপাঠ করিতেছে—পর্ব্বত নাচিতেছে—সমুদ্র করতালি দিতেছে—চন্দ্র-তারা পুষ্প ছড়াইতেছে। কে বলে এ সৃষ্ট জড়পদার্থ—কে বলে এ সৃষ্টি পর্ব্বত পাথর—নীরব—না না এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি সবই ভুল হইয়াছে। ঐ শুন জল স্থল অনল অনিল কথা কহিতেছে—শব্দব্রহ্ম ভূতসমূহের বিন্দুতে বিন্দুতে থাকিয়া বলিতেছেন—"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি!" আহা! কি স্বর্গীয় কি অমৃতপূর্ণ শব্দব্রহ্মের সমুচ্চারণ!

শব্দ যেমনই কঠোর তেমনই কোমল—যেমনই কর্কশ তেমনই মধুর! বজ্রের প্রচণ্ড রব ও বাঁশরীর সুমধুর ধ্বনি—উভয়ের কত পার্থক্য! বজ্ররব কেহই চায় না—মুরলীধ্বনি পশু পক্ষী মানবে যাচিয়া শুনিতে চায়। সাপুড়ের বাঁশী শুনিয়া তীক্ষ্ণ বিষধর লুটাইয়া পড়ে, হিংসা ছাড়ে ধরা দেয়। ব্যাধের বাঁশীতে সরল মৃগ স্বেচ্ছায় মস্তক পুরস্কার দিয়া বলে, "যব্ এক পত্র খড়্খড়ায়ে তব্ বৈঠি সিংহলকা দ্বীপ—তেরা বেণু-স্বর শুন্‌কে শির দিয়া বকসিস্। সিং বেচকে কৌড়ি করনা, মাস্ পাকায়েকে খাও—চামড়া লেকে আসন কিযে বেণুকা স্বর শোনাও।" মধুর শব্দের কাছে জীবের প্রাণ তুচ্ছ—জাতিকুল কল্পনা মাত্র। আমাদের প্রাণের তারের সঙ্গে ব্রহ্মের অদৃশ্য অব্যক্ত বীণার তারের মিল আছে। যখন সেই অদৃশ্য তার ঝঙ্কারিয়া উঠে, তৎসঙ্গে আমাদের প্রাণের তারও কাঁপিয়া উঠে। কোন্ দেশে—কোন্ দূরতম বিভাগে—প্রাণপ্রিয় প্রেমভরে বীণা বাজাইলেন—মানব অমনই সব কর্ম্ম ফেলিয়া সেই দিকে ছুটিল। কে ডাকিতেছে—আর ঘরে থাকা হলো না। কার বাঁশী বাজিতেছে—আর সংসার ভাল লাগিল না। যে মানবের ভিতর দিয়া এই মিষ্ট বাঁশী বাজে তিনি ধন্য!

মিষ্ট কথার মূল্য অনেক—সহজে মিলে না। আমরা সকলেই যদি সকল সময়েই মিষ্ট কথা বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে মানবপরিবারে কতই না শান্তি স্থাপিত হইত! ত্রিতাপ-জ্বালার কতই না উপশম হইত। পিতাপুত্রে, মাতাকন্যায়, ভ্রাতাভগ্নীতে, স্বামী-স্ত্রীতে কতই না মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত! আমাদের সংসার শান্ত, হাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যরসে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইত। আমাদের গৃহের বালকবালিকাগণ বাল্মীকির তপোবনে লবকুশের ন্যায় মিষ্টকণ্ঠে কি অভিনব রামায়ণই না গান করিত! আমাদের জীবনের সুর যদি শব্দব্রহ্মের সহিত মিলিত তবে আমাদের উপদেশে কত অশান্ত ব্যক্তি শান্ত হইত—কত পাপী পাপ ছাড়িয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়া পড়িত! শিশু প্রহ্লাদের কথায় দৈত্যপুরীর সমুদায় দৈত্য দেবদ্বেষে কেমন মাতিয়াছিল—সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গৌতমের উপদেশে কত শত লোক মঙ্গলের পথে কেমন ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঈশার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কত তাপিত প্রাণ কেমন জুড়াইয়া গিয়াছিল এবং নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনামকীর্ত্তনে কত তৃষিত আত্মা প্রাণ ভরিয়া শান্তিবারি পানে কেমন চিরতৃপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা যাহা পারিয়াছিলেন আমরা তাহা পারি না কেন? ইহার কারণ কি? আমরা কথা কহিতে জানি না—লোককে বুঝাইতে গিয়া চটাইয়া দিই। কেন এমন হয়? কারণ, আমাদের সঙ্গে শব্দব্রহ্মের মিলন আমরা অধিক সময়ে ভুলিয়া যাই।

ব্রহ্ম কেবলই মিষ্ট, কেবলই মধুর—তাই তাঁর নাম আনন্দ, অমৃত। আনন্দের সন্তান—অমৃতের পুত্র আমরা—অনেক সময় অভ্যাসদোষে সেই আনন্দ ও অমৃতকে হারাইয়া ফেলি। সেই জন্যই আমাদের সংসারে এত গোলযোগ, এত কলহ, এত কোলাহল। মানবের কণ্ঠে কেমন কোমল স্বর আছে; কিন্তু যতক্ষণ না তাহা বাহিরের বীণার স্বরের সঙ্গে এক হয় ততক্ষণ খুব মিষ্ট গায়কেরও কণ্ঠ হইতে তত মিষ্ট স্বর নির্গত হয় না। তবে চাই কি? মিলন! কার সঙ্গে মিলন? অনাদি চিরন্তন ভুবনরঞ্জন শব্দব্রহ্মের সঙ্গে। এক কথায় ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের মিলন চাই—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ চাই। তাঁহারই শব্দে তাঁহারই বংশীরবে, আমাদের সকল শব্দকে সকল রবকে মিলাইয়া লইতে হইবে। আমি কখন্ সুমিষ্ট হইব? যখন অনন্ত মাধুর্য্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিব। সেই অনন্তকে না লইলে না ভজিলে কেহই শান্ত স্নিগ্ধ ও মধুর হইতে পারে না। নারদের বীণা, নানকের রবাব, দাউদের তন্ত্রী, শ্রীগৌরাঙ্গের মৃদঙ্গ এত মিষ্ট কেন? কারণ, উহারা চিরদিন বিশ্বযন্ত্রীর যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আছে। মৃদঙ্গ-করতালের সুর বার বার বাঁধিতে হয় না—সেই গোড়ায়, সেই মূলে বাঁধা আছে—তাই কখনও বেসুরে বাজে না। আমাদের জীবনযন্ত্রকেও ঐরূপ সেই বিশ্বযন্ত্রীর যন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। মিলন চাই—যোগ চাই—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' চাই। সূতিকাগারের জন্ম রাখিলে হইবে না—দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইবে। যতদিন সুরে সুর না মিলাইবে, ততদিন যাহাই কেন কর না, কেবলই যাতনা। শঙ্করের কথা—"অস্মিন্ সংসারে যোজিতচিত্তঃ শোচতি শোচতি শোচত্যেব"।

মিলনই জগতের আকাঙ্ক্ষিত। মিলনে সুখ, মিলনে স্বর্গ। মিলন না থাকিলে অভিনয় জমে না—উপন্যাস ভাল লাগে না। বিন্দুতে বিন্দু মিলাইয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হইল—অণুতে অণু মিলাইয়া ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইল। মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ একের সঙ্গে অপরের মিলন জন্য। বিবাহবন্ধন, সংসারবন্ধন, জীবের সঙ্গে জীবের মিলনের কারণ। এ সৃষ্টির একটী আর একটীকে ডাকিতেছে। কেহই যেন একাকী থাকিতে পারিতেছে না। যিনি একাকী ছিলেন তিনি বহুধা আত্মপ্রকাশ করিলেন এই সম্মিলনসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য। মানব যদি ভগবানকে ভাল না বাসে, তাঁহার নিকটে না আসে, তাঁহার নামে জয়ধ্বনি না করে, তবে ভগবান বেদনা অনুভব করেন। সেই জন্যই তিনি জীবের নিকটে প্রেম ভিক্ষা করেন। হতভাগ্য জীব তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া কত অপমান করে, বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবান যে জীবপ্রেমাকাঙ্ক্ষী; তিনি শত অপমান সহ্য করিয়াও জীবের হৃদয়-কুটীরে একবার প্রবেশ করিবার পথ অন্বেষণ করেন। তাই তিনি শব্দরূপে আমাদের কণ্ঠে ও রসনায় প্রকাশ পাইতেছেন। এই শব্দকে অপমান করা, তুচ্ছ করা আমাদের কিছুতেই উচিত নহে। এই শব্দ হইতেই সকল পাইব, পঞ্চেন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয় ভগবানের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া জন্ম ভুলিব, মরণ ভুলিব, ইহকাল ভুলিব পরকাল ভুলিব। শিশুর সমুদায় দুঃখ-যাতনা যেমন দূরে যায় "মা" "মা" বলিয়া ডাকিলে—জীবেরও ত্রিতাপ-জ্বালা দূর হয় তেমনই ভগবানের নামোচ্চারণে। এই নাম-ব্রহ্মই আমাদের চির অবলম্বন। সৃষ্টিরও প্রথমে শব্দ, জীবের সাধনেরও প্রথমে শব্দ। জীবের শিক্ষায় দীক্ষায় শব্দ এবং সাধনভজনেও শব্দ। জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা যাতনা আনন্দ সবই শব্দে প্রকাশ পায়—শব্দ শুনিয়াই এক অপরের প্রাণের কথা বুঝিয়া লয়। এই শব্দই আমাদের সূতিকাগারে অস্ফুট ক্রন্দনরব এবং শ্মশানশয্যায় তারক ব্রহ্ম নাম।

সহসাধকগণ! আমরা আজি কোথায় আসিয়াছি তাহা একবার বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করি। এমন দিন ছিল যখন আমরা কেহই ছিলাম না। কিন্তু আজ কত দলে দলে আমরা এই বিশ্বরঙ্গালয়ে আসিয়াছি। আজ আমাদের সম্মুখে অসত্য নাই

অন্ধকার নাই। অসত্য অসৃষ্টিরূপ মহান্ধকারের পরে আজ আমরা সৃষ্টির কতই-না নব নব আলোকে ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতেছি। পূর্ব্বে যেখানে ছিলাম, এখন আর সেখানে নাই, পরে এখান হইতেও অনন্ত বিকাশের দিকে চলিয়া যাইব। এ সৃষ্টি ক্রমেই স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতেছে। অনন্তের মধুর বাঁশরী গানে—শব্দব্রহ্মের তানমানলয়পরিশুদ্ধ সঙ্গীততানে এই সৃষ্টি নাচিতে নাচিতে কোন্ অজানা অচেনা দেশের পানে ক্রমাগতই ছুটিতেছে। শব্দব্রহ্মের বেণুস্বরে সূর্য্য নাচিতেছে—চন্দ্রমা নাচিতেছে—ছায়াপথ, শিশুমার নাচিতেছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল নাচিতেছে—গঙ্গা যমুনা গোদাবরী নাচিতেছে—নরলোকে নরনারী, জলে স্থলে স্থাবর জঙ্গম সকলেই নাচিতেছে। ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের এ নৃত্য কখনও থামিবে না। এটা দেখিতেছি সঙ্গীতের দেশ, হাসির রাজ্য, আনন্দের সাম্রাজ্য! ‘আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দম্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।’ আমাদের উৎপত্তি আনন্দে, স্থিতি আনন্দে, পরিণতি আনন্দে। কে বলে আমরা সূতিকাগারে জন্মিয়াছি? কে বলে আমরা শ্মশানে মরিব। আমাদের জন্ম এত ক্ষুদ্র নয়, আমাদের মরণ এত সহজ নয়। আমরা অমৃতের সন্তান আনন্দের পুত্রকন্যা। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেশ্বর সাংখ্যসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এক্ষণে এই কথা বেশ স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, সাংখ্য ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কয়েকটী শ্লোক আছে, যাহা এই অনুমানের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। সেই শ্লোকগুলি এই—

"পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে ন নরাধিপ।
সাংখ্যানান্তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতং॥
বুদ্ধমপ্রতিবুদ্ধত্বাদ্বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধঞ্চ প্রাহুর্যোগনিদর্শনম্॥"

(মভা. ৩০৭ অঃ, ৪৫ ও ৪৬শ্লো.)।

অর্থাৎ—"সাংখ্যে পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতিরিক্ত আর কোনও তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যেরা যাহাকে পরম তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন, তাহা আমি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছি। যোগশাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের সার যে ব্রহ্ম তিনি কেবল অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়াই জীব হয়েন। সুতরাং, যোগশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীব এই দুয়ের কথাই বলা হইয়াছে।" এখানে ইহা স্পষ্টই বলা হইতেছে যে সাংখ্য জীবের অতিরিক্ত আর কোনও তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কেবল যোগদর্শনেই ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, অন্যান্য আরও অনেক সূত্রে ইহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, সাংখ্য পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহা হইলে আমরা এই দুইটী বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে সাধন করিতে পারি? অনেক প্রকারে এই সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, উপরি-উক্ত শ্লোকটীর পাঠ ভিন্নরূপ হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, ইহা প্রক্ষিপ্ত (interpolation) হইতে পারে; তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের সহিত ইহা একেবারে অসমঞ্জস নহে। উপরি-উক্ত শ্লোকটীর এই অর্থ হইতে পারে যে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষই পরম তত্ত্ব, ইহার উপরে যাহা, তাহা নিস্তত্ত্ব, এবং ইহার ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং, সাংখ্য যদি পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতিরিক্ত আর একটী তত্ত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইহার দ্বারা কোনও অসামঞ্জস্য সাধিত হয় না। অধিকন্তু, সাংখ্যের পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রগুলিতে একথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সব তত্ত্বগুলিই (এমন কি জীবও) পরম পুরুষের সর্গ (evolutes), তাহা হইলে সাংখ্য যদি পরম পুরুষকে কোনও তত্ত্ব বলিয়া না ধরেন তাহাতে কোনও দোষ হয় না। পুনশ্চ, পূর্ব্ব সূত্রগুলিতে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, জীব (যাহা পঞ্চবিংশ তত্ত্ব) ত্রিগুণী বা ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং এই উপাধি বর্জ্জন করিয়া জীব ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারে। এক্ষণে এই সকল কথা বলিয়া সাংখ্য যদি ঈশ্বরকে একটী অতিরিক্ত তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ না করেন তাহাতে বিশেষ দোষ হয় না, কোনও অসামঞ্জস্য থাকা তো দূরের কথা। পুনশ্চ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলিতে ইহা পুনঃ পুনঃ ও দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ এক, অর্থাৎ উভয়ের বিষয়টী এক; কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাতে ইহা দেখাইতেছে যে, এমন কি, যদিও সাংখ্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের কথা বলে না (একথা যে সত্য নহে আমরা পূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছি), তথাপি ইহা অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও ঈশ্বরের কথা বলে, এবং সাংখ্য যে ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকার করে, ইহা

স্রো সূত্রের কথা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বিরোধের মীমাংসা হইতেছে।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (যাহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের একটী অংশ), জীবের স্বভাব বা প্রকৃতি এবং জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যের যে মত তাহা পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে শ্লোকগুলিতে এই মতের অবতারণা হইয়াছে সেগুলি আমরা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিব।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্ সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।"

(গীতা, ২৪।২৫ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "আত্মাকে ছেদন করা যায় না, দহন করা যায় না, ক্লেদযুক্ত ও শোষণ করাও যায় না। ইহা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, অনাদি, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য।" এরূপ বর্ণনা কেবল পরমপুরুষেরই হইতে পারে, কারণ কেবল পরমপুরুষই বস্তুতঃ সর্ব্বগত এবং জীবাত্মা উপাধিযুক্ত; এই ব্যাখ্যাটী নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। সেই শ্লোকটী এই—

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

(গীতা, ৩০শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "এই আত্মা, যাহা সর্ব্বজীবের দেহে বিরাজমান, তাহা সর্ব্বদাই অবধ্য; এই কারণে, হে ভারত, সর্ব্বজীবের মৃত্যুতে তোমার শোক করা উচিত নহে।" ইহার সহিত ১৭শ শ্লোকটীও পাঠ করিতে হইবে; তাহা এই—

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি"।

অর্থাৎ, "যে আত্মা সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জান; ইনি অব্যয় বলিয়া কেহ ইঁহাকে বিনাশ করিতে পারে না।" এখানে এই কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারদিগের মতে 'তৎ' ও 'যেন' শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটীতে সব জিনিষটাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি"॥

(গী. ৭২ শ্লোঃ),

অর্থাৎ, "হে পার্থ, ব্রাহ্মী স্থিতি এইরূপ; এবং যিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি আর এই সংসারে পড়িয়া মুহ্যমান হন না; এমন কি, মৃত্যুকালেও যিনি তাঁহাতে স্থিত করেন তিনিই তাঁহার সহিত একেবারে যুক্ত হন"। ১৩শ অধ্যায়েও এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ"॥

(গী. ২২ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "যে পুরুষ (আত্মা) এই দেহে বিদ্যমান, তিনি প্রকৃতির অতীত; তিনি দ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা"। এইরূপ—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"॥

(গী. ২৭ শ্লোঃ),

অর্থাৎ, "যিনি পরমপুরুষকে সকল বিনাশশীল ভূতে অবিনাশিরূপে দেখেন এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন।" এ বিষয়ে ১৪শ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আরও জোর দিতেছে। সে শ্লোকগুলি এই—

"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা"॥

(গী. ৩ ও ৪ শ্লোঃ),

অর্থাৎ, "প্রকৃতি আমার (ঈশ্বরের) যোনি, আমি তাহাতে গর্ভ নিক্ষেপ করি। হে ভারত, তাহা হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়। হে কুন্তীপুত্র, প্রকৃতি সকল ভূতের মাতা এবং আমি (ঈশ্বর) তাহাদের পিতা"। সুতরাং ভগবদ্গীতার মতেও সাংখ্য ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং জীব এই ঈশ্বরেরই বহুধা প্রকাশ মাত্র; অথবা অন্য কথায়, জীব ত্রিগুণী বা ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর।

ভাগবত-পুরাণে কপিল ও দেবাহূতির কথোপকথনে যে সাংখ্যের কথা আছে তাহাতে আমরা ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ এক কথাই দেখিতে পাই। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক—

"অহং-মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমং॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরং।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরনির্বাণমখণ্ডিতং॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্॥"

(ভা. ৩য় স্কন্ধ, ২৫অঃ, ১৫—১৭ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "চিত্ত যখন কামলোভাদিরূপ মলা—যাহা 'আমি এই', 'ইহা আমার', ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হইতে উত্থিত হয়—হইতে মুক্ত হয় এবং তজ্জন্য নিজে

শুদ্ধ হয় ও সুখদুঃখে উদাসীনবৎ থাকে, তখনই জীবাত্মা ঈশ্বরকে দর্শন করে; যিনি প্রকৃতির অতীত, ত্রিবিধ-দুঃখাতীত, সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশবান, সূক্ষ্ম, অখণ্ড, জ্ঞান বিরাগ ও ভক্তিযুক্ত-চিত্ত; এবং জীবাত্মা তখন প্রকৃতি-কেও উদাসীনবৎ দর্শন করে, কারণ প্রকৃতি তখন তাহার নিকট শক্তিহীনা"। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥
এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ"॥

(ভা. ৩য় স্কন্ধ, ২৬অঃ, ৩—৭ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "পুরুষ ত্রিগুণাতীত। তিনি প্রকৃতির অতীত, অপ্রত্যক্ষ (unpersensible), স্বপ্রকাশ এবং ইঁহার দ্বারাই জগত ব্যক্ত। সেই পুরুষ কেবল লীলা-চ্ছলে সূক্ষ্ম ও দৈবী প্রকৃতিকে উপভোগ করেন; এই প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা। যিনি নিজের মত বহুপ্রকার জীব সৃষ্টি করেন সেই প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া পুরুষ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানবশতঃ মূঢ় হইয়া পড়েন। এইরূপে প্রকৃতিকে নিজ আত্মা ভাবিয়া পুরুষ নিজেকে সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কার্য্য প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সেই জন্য আনন্দরূপ ঈশ্বর—যিনি কেবল সাক্ষীস্বরূপ, কর্ত্তা নহেন, তাঁহার বন্ধন রচিত হয় এবং জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।" এই শ্লোকগুলিতে একটী জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে। এখানে প্রকৃতিকে 'দৈবী' ও পুরুষকে 'প্রকৃতিপর' অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বলা হইয়াছে। ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীধরস্বামী এই দুইটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তত্র চাবরণবিক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতি-র্দ্বিধা, তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপাধিরবিদ্যা। বিক্ষেপ-শক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী। পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ, তত্র যঃ প্রকৃত্যাঽবিবেকো সংসরতি স জীবঃ। যস্তু প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমে-শ্বরঃ।" অর্থাৎ, "আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার—আবরণ-শক্তিযোগে প্রকৃতি জীবোপাধি অবিদ্যা, এবং বিক্ষেপ-শক্তিযোগে প্রকৃতি পারমেশ্বরী মায়া। পুরুষে জীব ও ঈশ্বর এই দুই ভাব থাকা হেতু পুরুষও দুই প্রকার—প্রকৃতির অবিবেক নিবন্ধন যখন দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে তখনই পুরুষকে জীব বলা যায়, এবং যখন তিনি প্রকৃতিকে বশ করিয়া জগৎ রচনা করেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়।" অন্যান্য ভাষ্যকারেরা শ্রীধরের এই ব্যাখ্যায় কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, সুতরাং আমরা ইহাকে ঠিক বলিয়া ধরিতে পারি। এক্ষণে উপরি-উক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহা বেশ স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে ঈশ্বর আছেন এবং তিনি জগতের আদিকারণ, আর প্রকৃতি কেবল তাঁহার হস্তের যন্ত্রমাত্র এবং জীবাত্মাদিকল আবদ্ধ্যহেতু ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর।

ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আরও স্পষ্ট প্রমাণ :—

"এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥
প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ং।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ॥
প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কালঃ ইত্যুপলক্ষিতঃ॥
অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া॥"

(ভা. ৩য় স্কন্ধ, ২৬অ, ১৪—১৭ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "যে (চতুর্ব্বিংশতি) তত্ত্বের কথা জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, তাহা ত্রিগুণী ব্রহ্মের আবাসস্থান বলিয়া মৎ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে; পঞ্চবিংশ তত্ত্বটিকে কাল বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, কাল ব্রহ্মের শক্তি-বিশেষ, যাহা প্রকৃতিসংযোগহেতু আত্মজ্ঞানমূঢ় জীবের মনে ভীতি উৎপাদন করে; আবার কেহ কেহ বলেন যে যিনি সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন তিনিই ঈশ্বর এবং তাঁহাকে কাল বলা হয়। ঈশ্বরকে বলা যাইতে পারে যে তিনি তাঁহার ঐশীশক্তিবলে সকল জীবের নিয়ন্তারূপে তাহাদের অন্তরে পুরুষরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং কালরূপে তিনি বাহিরেও বিদ্যমান রহিয়াছেন।"

উপনিষদও ঐ একই কথা প্রতিপাদন করিতেছেন। উপনিষদের দর্শনতত্ত্ব সাংখ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং উপনিষদ্ এই কথাই প্রতিপাদিত করিতেছেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদ বা অজ্ঞেয়বাদের উপদেশ করেন না, পরন্তু ঈশ্বরাস্তিত্বই সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদন করেন।

(সম্পূর্ণ)

মহাভারতের
নীতি-বাক্য।

বনপর্ব্ব।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্তৃক সংগৃহীত)

যুধিষ্ঠির।—ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র।

ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপঃ ও শৌচ এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যজুর্ব্বেদ-বিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোকসমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে।

ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজের স্বরূপ ও তপস্বীগণের ব্রহ্মস্বরূপ।

সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শান্তি।

ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয় তাঁহাদিগের পরম পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

(অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—১০১

দ্রৌপদী।—কর্ম্মই উত্তম মধ্যম প্রভৃতি পৃথক পৃথক লোকপ্রাপ্তির সাধন ও কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য।

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম দয়া ক্ষমা সরলতা ও লোকাপবাদভীরুতা অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কখন ইহলোকে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

(ঐ—১০২

সমুদায় লোক ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলে; তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় ও সুখ-দুঃখের বিধাতা।

(ঐ—১০৪

ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্যকর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু 'এই পরমেশ্বর' ইঁহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না।

(ঐ—১০৫

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভ লোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক; সুতরাং সে পুণ্যফলানধিকারী ও ধার্ম্মিকসমাজে জঘন্য বলিয়া পরিগণিত। সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

(ঐ—১০৭

যুধিষ্ঠির।—ধর্ম্মই সনাতন সুখ। ধর্ম্ম কখন বিফল হয় না ও অধর্ম্মও ফলবান হয় না।

(অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—১০৯

সাগর পার-লিপ্সু বণিকদিগের তরণীর ন্যায় সুরলোক-গমনোন্মুখ মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র ভেলা।

(ঐ—১০৮

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না।

(ঐ

ফলদর্শন না হইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে।

অসূয়া-বর্জ্জিত হইয়া প্রযত্ন সহকারে যজ্ঞ ও দান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কর্ম্মের ফল ইহলোকেও দৃষ্ট হইতেছে।

(ঐ—১১০

ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাঁহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবমাননা করিও না।

(ঐ

দ্রৌপদী।—দৈবপর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। সতত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও, কদাচ গ্লানিযুক্ত হইও না।

(ঐ—১১১

যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়। আর যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফল লাভ করত অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে।

সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয়চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীর ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ।

(ঐ—১১৪

আমি কর্ম্ম করিলে অর্থসিদ্ধি হয় না এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না।

(ঐ—১১৫

ভীম।—দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব এই কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্মই এই জগতের মূল, ধর্ম্মাপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট নহে।

(ঐ—১২১

হংস।—উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সঙ্গতি সাতিশয় গুণপ্রসবিনী হয় সন্দেহ নাই।

(ঐ—১৯৫

দময়ন্তী।—সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধস্বরূপ। ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।

(ঐ—২১৬

নল।—দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র।

(ঐ—২১৬

দময়ন্তী।—কাল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না।

দময়ন্তী।—মানবগণের সুখদুঃখ ও শুভাশুভ সকলই দৈবায়ত্ত তাহার সন্দেহ নাই।

(ঐ—২৩৭

সুদেব।—পতিই নারীর প্রধান ভূষণ।

(ঐ—২৪৮

নল।—স্ত্রীলোকের স্বভাব অতি চঞ্চল।

(ঐ—২৫৭

ঋতুপর্ণ।—এই সংসারের কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা নাই; এক পুরুষে জ্ঞানের সম্যক সমাবেশ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

(ঐ—২৬১

বৃহদশ্ব।—সুখ দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর।

ঐ।—পুরুষার্থের অস্থিরত্ব জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত।

ঐ।—বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।

ঐ।—দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত পুরুষকার নিষ্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষণ্ণ বা অভিভূত হয় না।

(ঐ—২৮৭—৬

পুলস্ত্য।—মনুষ্যের বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য।

(তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়—৩২৫

পুলস্ত্য।—যাহার হস্তদ্বয় পদদ্বয় মন বিদ্যা তপ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট, যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদিরহিত, অল্পাহার, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

(ঐ—২৯৫

লোমশ।—অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখ সম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করত শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

(ঐ—৩৫৮

ঐ।—অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা জন্মে; সেই নির্লজ্জতা-প্রভাবেই বিনাশ।

(ঐ—৩৫৯

লোপামুদ্রা।—এক বিদ্বান সাধু পুত্র বহুসংখ্যক অসাধু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(ঐ—৩৭২

লোমশ।—তপস্যাই লোকস্থিতির কারণ।

(ঐ—৩৮১

উশীনর।—ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তদ্রূপ পাপ জন্মে।

(ঐ—৪৬১

শ্যেন—যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরবিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে; পরস্পর-অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম।

(ঐ—৪৬২

হনুমান।—আচার হইতে ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে।

(ঐ—৫২৮

যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

(ঐ—৫২৯

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে আসক্ত হয়, সে অবশ্যই সেই পাপের ফল ভোগ করে।

(ঐ—৫৬৭

কুবের।—যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টি না করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়; যে ব্যক্তি কার্য্যবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ বৃথাচার ও বৃথাসমারম্ভ, সেই ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকাল অশেষ ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয় সামর্থ্যাভিলাষী প্রবঞ্চনাপর ও দুরাত্মা সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

(বক্ষযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়—৫৭২। ৩

সঙ্গীতে ভাব।

(EMOTION)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্)

সঙ্গীত ভাবসম্বন্ধীয় ললিত কলা। অন্তরের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব তাহা সঙ্গীতেরই দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাই ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ। ললিত কলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক Kantর মতে সৌন্দর্য্য মানুষকে বিশুদ্ধ, স্থায়ী ও নিঃস্বার্থ আনন্দ দেয় এবং এক সময়ে বহু লোক সেই আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়। অতএব উত্তম সঙ্গীতের দ্বারাও মানুষের চিত্তে ঐরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টিজনিত আনন্দের উদ্ভব হওয়া উচিত। যে সঙ্গীতের দ্বারা ঐরূপ সৌন্দর্য্য বা ভাবের সৃষ্টি না হয়, তাহা সঙ্গীত নামের যোগ্য নয়।

আজকাল আমাদের ওস্তাদি ধ্রুপদ বা খ্যাল গানে ঐরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকে গায়কদের বড় একটা লক্ষ্য থাকে না, ফলে ওস্তাদি গানের উপর অধিকাংশ মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন লোকই চটা—বাস্তবিক চটিবারও কথা। যে সঙ্গীত মানুষকে ইহলোকের দুঃখ-ক্লেশ, ভয়-ভাবনা দূর করিয়া অনন্ত আনন্দলোকে লইয়া যাইবে, যে সঙ্গীত চির-বিচ্ছেদজর্জ্জর চিত্তে শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিবে, যে সঙ্গীত পৃথিবীর সর্ব্বজ্বালাযন্ত্রণা ভুলাইয়া স্বর্গের মন্দাকিনীধারা পান করাইবে—সেই সঙ্গীতের নামে প্রতিপদে বাদানুবাদ, কলহ কে সহ্য করিবে? আজকালকার ওস্তাদি গানে প্রায়ই দেখা যায় যে, গায়ক ও বাদকের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব চলে—কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে! ইহার দ্বারা রসসৃষ্টি হয় না—গানের নামে তাণ্ডবলীলা চলে। গায়কের পক্ষে গানই প্রধান; গানের সুর ও কথা সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; এবং বাদকের কর্ত্তব্য গায়ককে অনুসরণ করা—মৃদুভাবে তবলা বা মৃদঙ্গে ঘা দিয়া গানের ছন্দ বাহির করা—গায়ককে কোনরূপে অতিক্রম করিয়া নিজের বাহাদুরি দেখানো নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে, ওস্তাদের এই সকল সঙ্গীতে 'কৌশল আছে কিন্তু দরদ নাই'। এই দরদই আমরা সঙ্গীতে চাই—এই দরদই অপরের প্রাণ গলাতে পারে। গানের নামে বাদকের সহিত কসরৎ গানের উদ্দেশ্য নয়। যিনি প্রকৃত artist বা কলাবিৎ হইবেন—তিনি গানের ভাবকে কখনও উপেক্ষা করিবেন না—ভাবহীন প্রাণহীন গানে কাহার মন আকৃষ্ট হইবে?

আমি বলিয়া আসিলাম যে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বা মানুষের সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করাই ললিত কলার উদ্দেশ্য। আমাদের ওস্তাদি সঙ্গীতে যদি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস না থাকে বা অভাব থাকে, সে দোষ কোনরূপেই মার্জ্জনীয় নয়। কারণ সৌন্দর্য্যসৃষ্ট না হইলে সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই বিফল হইল। আমার এই কথায় কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সঙ্গীতের সুর-তাল যদি ঠিক হয়, তা'হলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে কিঞ্চিৎ শিক্ষা বা এ বিষয়ে culture চাই—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে কিছু জানা চাই। আমি স্বীকার করি যে সুর ও তাল ঠিক হইলে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে আনন্দ ভোগ করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। এ আনন্দ intellectual বা বিজ্ঞানের আনন্দ—æsthetic বা সৌন্দর্য সৃষ্টজনিত আনন্দ নয়। সঙ্গীত যদি intellectual বা বিজ্ঞানের আনন্দ দেয়, তাহলে ললিতকলা হিসাবে ইহা খাট হইবে—কারণ ললিতকলা universal বা সার্ব্বজনীন আনন্দ প্রদান করে; বহুলোক একসঙ্গে সে আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ওস্তাদগণ সুর তাল বা সঙ্গীতের ব্যাকরণের দিকে অতিমাত্রায় লক্ষ্য দেন, ফলে রসসৃষ্টির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। তবে আমি একথা বলি না যে সুর তালের প্রতি লক্ষ্য দিবার দরকার নাই, কারণ রসসৃষ্টি করিতে হইলেও ঐ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার, আমি বলি, সুর তাল ও ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া গান গাওয়া অসম্ভব নয়। পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গীতে যে ভাবের দিক উপেক্ষা করা হইত না তাহার প্রমাণ সঙ্গীতবিশারদ তানসেন সম্বন্ধে কিংবদন্তী। তানসেন গানের ভাবে সুরে তালে এরূপ তন্ময় বা আত্মহারা হইয়া গান গাইতেন যে, মল্লার রাগিণী গাইলে বাদল উপস্থিত হইত, দীপক রাগিণী গাইলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত। এইরূপ তন্ময় বা আত্মহারা ভাব সঙ্গীতে চাই। ইহার দ্বারাই রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। আর এইরূপ গানই মানুষকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে। তাই তেজস্বী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন :—

"Drama and music are by themselves religion, any song, lovesong or any song, never mind; if one's whole soul is in that song, he attains salvation just by that; nothing else he has to do; if a man's soul is in that, his soul gets salvation."

তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যশিল্পী Carlyle সঙ্গীতের সম্বন্ধে বলেন :—"A kind of inarticulate, unfathomable speech, which leads to the edge of the Infinite and lets us for moments gaze into that!"

সঙ্গীত যে শ্রেষ্ঠ যোগ এ কথা মিথ্যা নয়—যদি সেই ভাবে প্রাণ-মন ডুবাইয়া গীত হয়। পাশ্চাত্য সুরশিল্পী রোমাঁ রোল্যাঁর কথা আমরা কিছু কিছু জানিয়াছি; তিনি বলেন, দুঃখ কষ্ট যখন তাঁকে পীড়িত করে, তখন তিনি সঙ্গীতসরোবরে স্নান করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হ'ন। আমাদের দেশে সঙ্গীতের উন্নতি হোক্ কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি। সঙ্গীতের নামে বাদানুবাদ, বিরোধ দেশ হইতে তিরোহিত হোক।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

এই যে প্রভাত আলো
এই যে কল পাখী
এই যে সবুজ শাখী
চিত্ত কোথায় ?

এই যে শ্যামল তৃণ
এই যে ফুলের রাশি
হাওয়ায় কল বাঁশী
চিত্ত কোথায় ?

এই যে রবির কিরণ
মেঘের সজল কালো
রাতের জ্যোৎস্না-আলো
চিত্ত কোথায় ?

আনন্দেরি ধারা
বইছে পাগল পারা
ধরণী তার হারা
চিত্ত কোথায় ?

এই যে তাঁহার পরশ
সকল দুঃখে সুখে
বীণা বাজায় বুকে
চিত্ত কোথায় ?

ডাক আসে যে তাঁর
ভেঙ্গে সকল দ্বার
খোঁজ করে আমার
চিত্ত কোথায় ?

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্।

II সা দা দা। দা দা -ᵖপা I পা পা -া। -া -া -া I পা -র্সা র্সা।
এ ই যে প্র ভা ত্ আ লো ॰ ॰ ॰ ॰ এ ই যে

। ণা দা -পা I মা মা -া। -া -া -া I মা পা ᵖমা। জ্ঞা জ্ঞা -া I
ক ল ॰ পা খী ॰ ॰ ॰ ॰ এ ই যে স বু জ

I রা রজ্ঞা -মজ্ঞা। -রজ্ঞা -া -ঋসা I সা -ঋা জ্ঞা। ঋা সা -া I -া -া -া।
শা খী॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰॰ চি ॰ ত্ত কো থা য় ॰ ॰ ॰

। -া -া -া I সা -া দা। দা ণা -া I ণা সা -া। -া -া -া I ᵐজ্ঞা -া জ্ঞা।
॰ ॰ ॰ এ ই যে শ্যা ম ল্ তৃ ণ ॰ ॰ ॰ ॰ এ ই যে

। জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া। -া -া -া I মা মা মা। মা মা -া I
ফু লে র রা শি ॰ ॰ ॰ ॰ হাও য়া য় ক ল ॰

I ᵐমা মা -া। -জ্ঞা -ঋা -সা I সা -ঋা জ্ঞা। ঋা সা -া I -া -া -া।
বাঁ শী ॰ ॰ ॰ ॰ চি ॰ ত্ত কো থা য় ॰ ॰ ॰

। -া -া -া II
॰ ॰ ॰

১´ • ১´ • ১´
II দা -া দা। ণা র্সা -া I ণা র্সা -া। -া -া -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া।
এ ই যে র বি র কি র ণ • • • মে ঘে র

• ১´ • ১´ •
। র্ঋা র্সা -া I ণা র্সা -া। -া -া -া I র্মা র্মা -া। র্মা -া র্মর্জ্ঞা I
স জ ল্ কা লো • • • • রা তে র জ্যো ৎ স্না•

১´ • ১´ • ১´
I র্রা র্রর্জ্ঞা -র্মর্জ্ঞা। -র্রর্জ্ঞা -া -র্ঋর্সা I র্সা -র্ঋা র্জ্ঞা। র্ঋা র্সা -া I -া -া -া।
আ লো• • • • • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • •

• ১´ • ১´ • ১´
। -া -া -া I র্সা র্সা -া। র্ঋা র্সা -া I ণা ণা -া। -া -া -া I ণর্সা -া ণা।
• • • আ ন ন্ দে রি • ধা রা • • • • ব ই চে

• ১´ • ১´ •
। দা পদা -ণা I দা পা -া। -া -া -া I পা পা -জ্ঞা। জ্ঞা পা -া I
পা গ• ল্ পা রা • • • • ধ র • গী তা র

১´ • ১´ • ১´ •
I পা ণদা -া। -া -া -া I সা -ঋা জ্ঞা। ঋা সা -া I -া -া -া। -া -া -া II
হা রা• • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
II দা -া দা। ণা র্সা -া I ণা র্সা -া। -া -া -া I র্জ্ঞ র্জ্ঞা -া। র্ঋা -া র্সা I
এ ই যে তাঁ হা র প র শ্ • • • স ক ল্ দুঃ • খে

১´ • ১´ • ১´
I ণা র্সা -া। -া -া -া I র্মা র্মা -া। র্মা র্মা -র্জ্ঞা I র্রা র্রর্জ্ঞা -র্মর্জ্ঞা।
সু খে • • • • বী ণা • বা জা য় বু কে• • •

• ১´ • ১´ •
। -র্রর্জ্ঞা -া -র্ঋর্সা I র্সা -র্ঋা র্জ্ঞা। র্ঋা র্সা -া I -া -া -া। -া -া -া I
• • • • • চি • ত্ত কো থা য়্ • • • • • •

১´ • ১´ • ১´
I র্সা -া র্সা। র্ঋা র্সা -া I ণা -া -া। -া -া -া I র্সা র্সণা -দা।
ডা ক্ আ সে যে • তাঁর • • • • • ভে সে• •

• ১´ • ১´ •
। ণা দা -া I পা -া -া। -া -া -া I পা -া জ্ঞা। পা -মা পা I
স ক ল্ যায় • • • • • খোঁ জ্ ক রে • আ

১´ • ১´ • ১´ •
I ণদা -া -া। -া -া -া I সা -ঋা জ্ঞা। ঋা সা -া I -া -া -া। -া -া -া II II
রায় • • • • • চি • ত্ত কো থা য়্ • • • • • •

সংবাদ।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ।—গত ১০ই ও ১২ই পৌষ শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহর্ষিদেবের সমসাময়িক ৺নন্দলাল মৈত্র মহাশয় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীরামপুরে ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র অগ্নি প্রথম স্থাপন করেন; পরে তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। অনন্তর মৈত্রমহাশয়ের অবর্ত্তমানে তদীয় আত্মজতুল্য ৺মন্মথনাথ লাহিড়ী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺প্রমথনাথ লাহিড়ী—উভয়েই আজীবন আপন আপন শক্তি ও প্রীতির আহুতি দিয়া ব্রহ্মোপাসনার সেই পবিত্র অগ্নিকে দিন দিন বর্দ্ধিত ছাড়া কখনও নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। তাঁহাদের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরিয়া উপযুক্ত সাধক ও সেবকের একান্ত অভাবে মনে হইয়াছিল, বুঝি, এই সুসমৃদ্ধ উপনগরীর বুকের উপর হইতে সেই পবিত্র অগ্নিকণা চিরদিনের জন্যই নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে, ৺প্রমথনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ পরেশনাথ ও শ্রীমান্ সাবনাথ বর্ত্তমানে উপযুক্ত হইয়া ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পরিবারবর্গ এবং তাঁহাদের শ্রীরামপুরস্থ বন্ধুগণের উদ্যম ও সহযোগিতায় প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের পিতামহ ও পিতৃদেবের সাধনাকেই আপনাদের জীবনে বরণ করিয়া লইতেছেন—নির্ব্বাপিতপ্রায় ব্রহ্মাগ্নিকে আবার তাঁহারা ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন।

এতদুপলক্ষে গত ১১ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ উদীয়মান গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীশিশিরকুমার দত্ত এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামপুর গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মোৎসবের পবিত্র পীঠস্থান ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহেই প্রাতরুপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। উপাসনাগৃহটী পত্র-পুষ্প ও পতাকা দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রভাতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। অতঃপর কলিকাতা হইতে সকলে আসিলে বেলা ৯ ঘটিকায় উপাসনা আরম্ভ হয়।

সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল ৺মহেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের গৃহে। এই উভয় কালের উপদেশ ও উপাসনার ভার লইয়াছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এবং সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ও শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

১২ই পৌষ প্রাতঃকালে যথারীতি উপাসনাদি হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই দুইদিন ব্যাপী উৎসবের অঙ্গরূপে প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে সান্যালভবনে 'যুবকসমিতি' এবং দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে ১নং বেনেপাড়া লেনে ভাদুড়ীভবনে 'আর্য্যকন্যাসম্মিলন' ও বালক শিশিরকুমারের স্মৃতি উপলক্ষে 'বালকবালিকাসম্মিলন' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্থানীয় অধিবাসীগণ সকলেই এই ব্রাহ্মসমাজকে সানন্দে আপনাদের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্তঃপুরচারিণীরাও নিঃসঙ্কোচে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ইহাই চিরন্তন সাধনা—'হিন্দুসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া নয়, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

সমাগত ভদ্রজনগণের আদর-আপ্যায়ন ও তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন অতি সুন্দর হইয়াছিল।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ।—গত ৯ই পৌষ শুক্রবার হইতে উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। এতদুপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপর প্রথম দিনের সান্ধ্য উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি উক্ত দিবস যথাসময়ে বেদীগ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন; উপদেশের বিষয় ছিল 'মামেকং শরণং ব্রজ'। আদিব্রাহ্মসমাজের আজীবন অনুরাগী, উদীয়মান গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সানন্দে সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

পুস্তক বিতরণ।—এলগিন রোড পোঃ অঃ, ২নং চক্রবেড়ে লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ মল্লিক তাঁহার প্রণীত বহু প্রশংসিত "সৎপ্রসঙ্গ" ও "দুই ভাই" পুস্তক দুইখানি বিনামূল্যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ পুস্তকালয়ে বিতরণ করিবেন। সম্পাদকগণ কেবলমাত্র তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট তাঁহার নিকট পাঠাইলেই হইবে। "সৎপ্রসঙ্গ"-খানি প্রায় দুই শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ॥০। "দুই ভাই" উপন্যাস—মূল্য ১৲। ভাল বাঁধান ও চিত্রযুক্ত।

শোক-সংবাদ।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।—গত ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ বেলা ৪ ঘটিকার সময় ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁহার স্বীয় বাসভবনে আব্দুল রসীদ নামক একজন মুসলমান আততায়ীর

হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৭১ বৎসর। তিনি সম্প্রতি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। উক্ত দিবস অপরাহ্নে আব্দুল রসীদ স্বামীজীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত ইস্‌লামধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহে, কিন্তু স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ঐ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অতঃপর আব্দুল রসীদ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামীজীর আদেশে তাঁহার ভৃত্য ধরম সিং তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া যায়। জলপান শেষ করিয়াই সে দৌড়াইয়া স্বামীজীর গৃহে পুনরায় প্রবেশ করে এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি চারি-পাঁচটী গুলি ছোড়ে। এই সংঘাতিক আঘাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া ভৃত্য ধরম সিংও আততায়ীর হস্তে ভীষণরূপে আহত হয়; সুখের বিষয়, হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়া সুচিকিৎসায় সে ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

জলন্ধরের আইনব্যবসায়ী লালা মুন্সীরাম ভগবৎ-প্রেরণায় কিরূপে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হইয়া আর্য্যসমাজের কর্ণধার হইলেন, কিরূপে তিনি গুরুকুলের প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিরূপে তিনি রাউলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে রাজনীতিক আন্দোলনে সংসৃষ্ট হইলেন, কিরূপে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী হইয়া হিন্দুমুসলমান-মিলন ও অসহযোগপ্রচারে ব্রতী হইলেন, অতঃপর কি কারণেই বা রাজনীতিক সংস্রব বর্জ্জন করিয়া হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলনে মনোনিবেশ করিলেন সে সব পুরাণ ইতিকথার আলোচনা বহু সংবাদপত্রেই হইয়াছে, সুতরাং আমরা এখানে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে ভারতের অন্ধকারপ্রায় জাতীয় জীবনের কত বড় মঙ্গল দীপটী যে আজ নিবিয়া গেল, তাহার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধকার যে আরও কত নিবিড় হইয়া উঠিল,—যে ক্ষতি যে আঘাত আমরা পাইলাম, তাহার দুঃসহ বেদনা অনবরত বুক বাজিতে থাকিলেও—আজ সে কথা ভাবিবার অবসর আমাদের নাই। আজ শুধু মনে পড়িতেছে ভারতের যুগ-যুগ-ব্যাপী দুর্ভাগ্য-গাথা—তাহার দীর্ঘকালের একজাতিত্ব লাভের প্রয়াস বোধ হয় অনেক দূর পিছাইয়া গেল।

এই গুপ্তহত্যার অন্য যে কোন কারণই থাক না কেন, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিদ্বেষ এবং ধর্ম্মান্ধতাই ইহার অন্যতর প্রধান কারণ। ভগবৎপ্রীতিমূলক সত্যধর্ম্মকে অন্তরে গ্রহণ করিলে কি হিন্দুসমাজে, কি মুসলমানসমাজে ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অবসর থাকিতে পারে না। প্রার্থনা করি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুর ফলে দেশ হইতে, সকল সমাজ হইতে ঐ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তিরোহিত হৌক, দেশে পুনরায় মিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হৌক, শান্তির অমৃত ফল উৎপন্ন হৌক।

গ্রন্থ-পরিচয়।

দুভাই।—সচিত্র সামাজিক ও নৈতিক উপন্যাস। "স্বাস্থ্য" ও "সৎপ্রসঙ্গ" প্রণেতা শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক প্রণীত। ৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ এবং ২নং চক্রবেড়ে লেন, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা। ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারের ১২২পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

সকল দেশেই গল্পসাহিত্যের আদর অধিক—যাঁহারা গল্পের অনুরাগী—কষ্ট করিয়া নীতিতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিতে অভিলাষী নহেন, তাঁহারা যাহাতে কথার ছলে সুশিক্ষা পান, পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারেন, সামাজিক দোষ দূর করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন, প্রবীণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন। একই পিতার দুই পুত্র, সৎসঙ্গগুণে একজন কত উন্নত হইতে পারে, এবং আর একজন সংসর্গদোষে কিরূপে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয় তাহা বিশদভাবে এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের যে তত্ত্বকথা উপনিষদে আছে, শ্রদ্ধেয় সুপ্রবীণ গ্রন্থকার এই উপন্যাসখানিতে তাহাকেই মানুষের সমাজে নামাইয়া আনিয়া মূর্ত্ত করিয়া দেখাইয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি, বিধবা, কুমারী, অনাথ, দরিদ্র, প্রায় সকল শ্রেণীরই সুখ-দুঃখের কথা আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি একাধারে গল্প ও সদুপদেশে পূর্ণ। আশা করি গ্রন্থখানি সকলের নিকট সমাদৃত হইবে।

দানপ্রাপ্তি।

কলিকাতা, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় ১৮৪৬ শকের ২৯ শে ভাদ্র তারিখে আদিব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় ১০০৲ এক শত টাকা দিয়া গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১৮৪৮ শকের ১৫ই আশ্বিন) তারিখে উক্ত ২০০৲ দুই শত টাকা ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে শত করা বাৎসরিক ৬॥০ টাকা সুদের ৩৬ মাসের স্থিত গচ্ছিতের ১৬০ নং রসিদ আদিব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে উক্ত টাকা এককালীন খরচ না করিয়া কেবল মাত্র ইহার সুদের টাকাই আদিব্রাহ্মসমাজের হিতার্থে ব্যয় করা হয়। শিতিকণ্ঠ বাবুর এই উদারতা সমাজহিতৈষীগণের অনুকরণীয়।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়-ব্যয়।

১৮৪৮ শকের অগ্রহায়ণ মাস।

আয়	..	৭৯৬৷৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৭৷৶০
সমষ্টি	...	৮০৪৶৬
ব্যয়	...	৫৯৭৵৬
স্থিত	...	২০৭৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

এককালীন দান	২০০৲
ঋণগ্রহণ	৩০৬ ৫৬
সম্পেক্ষ আদায়	২২৲
হাওলাত আদায়	৪৲
সমষ্টি	৬১১ ৫৬

তত্ত্ববোধিনী।

পত্রিকার চাল মূল্য	৬৲
বিজ্ঞাপনের মূল্য	১৪৲
সমষ্টি	২০৲

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তকমুদ্রণ	৫০৶০
কাগজের মূল্য	৫০৲
সমষ্টি	১০১৶০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৸০
গীতারহস্যের মূল্য	৬০৲
ঐ মাশুল	২৸০
সমষ্টি	৬৩৷০
সর্ব্ব সমষ্টি	৭৯৬৷৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	৫৲
বেতন	৪১৷/৩
সরঞ্জামী	২ /০
মাশুল	১।/৬
ইলেকট্রিক	৭৶৬
কেরোসিন	৷৵০
ড্রেণ পরিষ্কার	৷৶০
ঋণশোধ	১০৯৶০
হাওলাত	৩৲
বারবরদারী	২৷৶৬
বিবিধ	৷৶৬
সম্পেক্ষ	৫৲
কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর জন্য	১৭৫ /৬
সমষ্টি	৩৫০৸৶৯

তত্ত্ববোধিনী।

দপ্তরী	৬৷৶০
মাশুল	৪৸৶৬
বেতন—কর্ম্মাধ্যক্ষ	১১।০
" হিসাবরক্ষক	৯৲
" বেহারা	৪৲
বিজ্ঞাপন	১০৲
বিবিধ	।৶৬
সমষ্টি	৪৬৷/০

যন্ত্রালয়।

বেতন	১০৫৷০
তৈল	৷০
সাজিমাটী	৷০
রুল ঢালাই	।৩
দপ্তরী	৯৶০
মাশুল	৶০
তামাক	।৶০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১১৷৶৬
লেই	৶৬
বিবিধ	/৬
সমষ্টি	১২৮৷/৯

পুস্তকালয়।

বেতন—কর্ম্মাধ্যক্ষ	১০৲
দপ্তরী	৪৲
মাশুল	৷/০
গীতার মূল্য	৩৬৷০
ঐ মাশুল	৫৶০
ঐ কমিশন	৪।০
ঐ দপ্তরী	১০৲
সমষ্টি	৭০।০
সর্ব্ব সমষ্টি	৫৯৭/৬

সপ্তনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০২ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

কথায় নয়—কাজে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও। তোমাকে নমস্কার।

ভগবানের পথে এই পৃথিবীতে কত শত সাধু মহাত্মা পরস্পরের সহিত আড়াআড়ি করিয়া দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এখানে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম ভিত্তির উপর গ্রথিত সমাজের কার্য্যভার আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্রশক্তি দীনহীন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়ায় আমি নিজের অক্ষমতায় ভয়ে লজ্জায় ও ক্ষোভে সত্যসত্যই ব্যথিতচিত্ত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। সকল বিষয়ে সীমাবদ্ধ মানবের পক্ষে বর্ত্তমান দুঃখদৈন্যের ভিতর, বর্ত্তমান নিরাশা-নিরানন্দের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতম বীজ সত্যসত্য প্রাণের ভিতর ধারণ করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইলে যে কিপ্রকার পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, যিনি এই ভাবে সংসারপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। কিন্তু সম্মুখে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত পাইয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কে অগ্রসর হইবার আনন্দ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে? তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে, তাঁহাদেরই চরণতলে দাঁড়াইয়া এই মহান ভার আমি আমার এই ক্ষুদ্র মস্তকে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছি। পরলোকগত ঈশানচন্দ্র বসু প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অজ্ঞাতনামা কিন্তু নীরবকর্ম্মী মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের অক্লান্ত সেবায় নীরবে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, প্রাণে নববল সঞ্চয় করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কটমোচন বীজমন্ত্র সরবে ও নীরবে, সজনে ও নির্জ্জনে সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি। যে ভগবানের কৃপা হইলে পঙ্গু যে, সেও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে; মূক যে, সেও বক্তা হইয়া উঠিতে পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বন্ধুগণের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে সেই ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমিও এই মহাভার অক্লেশে বহন করিতে পারিব।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে সর্ব্বপ্রথমেই চারিদিক হইতে এই এক প্রশ্ন কানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যখন চতুর্দ্দিকে শত শত ধর্ম্মসমাজ জাগিয়া উঠিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং সেই সকল ধর্ম্মসমাজ যখন বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজেরই মঙ্গল

উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় কি না? ইহা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ ও বিভিন্ন কর্ম্মসঙ্ঘ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্য গ্রহণ করিবার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাগণ, তাঁহাদের সমসাময়িক অন্ধকারের মধ্যে উহার প্রয়োজন স্বভাবত যেরূপ তীব্রভাবে প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়া যে বলের সহিত তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন তত তীব্ররূপে অনুভব করিবার অবকাশ পাই না; এবং কাজেকাজেই ব্রাহ্মসমাজের মূল পত্তনভূমি উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা সেই পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের ন্যায় উপযুক্ত বলের সহিত প্রচার করিতেও উদ্যুক্ত হই না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি সত্যই সর্ব্বতোভাবে সংসিদ্ধ হইয়াছে? যতদিন মানুষ সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং যতদিন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিবে না, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সংসিদ্ধ হইতে পারিবে না এবং ততদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতে পারিবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারও ব্যর্থ বলা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অবধি যে গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে স্বীয় করালগ্রাসে কবলিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যে বিষবীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই গৃহবিবাদ সেই অন্তর্বিরোধ, সেই অধর্ম্মের বিস্তারই আজ আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলেই মনে হয় বটে যে, এই গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধ না জানি কি এক নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অমঙ্গলের সূচনা করিয়া দিয়াছে—চারিদিকে বন্ধুবিচ্ছেদ, গুপ্তহত্যা—দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতে মন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসে। কিন্তু ধ্যানস্তিমিতলোচন ঋষিদের ন্যায় অন্তরে দৃষ্টি গভীররূপে সন্নিবিষ্ট করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এই আপাতভীষণ অমঙ্গল ভেদ করিয়াও শান্তি ও মিলনের এক মহান মঙ্গল্য মন্ত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। এই গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধের দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া ভারতবাসীর ঘরদুয়ার সমস্ত ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিয়াছে বলিয়াই সেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখ হইতে ভগবানেরই এই সত্যবাণী বিনিঃসৃত হইয়াছে যে, "শুধু কথায় আর কাজ নাই, এখন অবধি কাজের কথা চাই।" এই অন্তর্বিরোধের ফলেই, জনসাধারণ যে দুর্নীতি ও অধর্ম্মের পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, মনে হয়, যেন তাহারা একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং মনে হয় যেন তাহাদের অন্তরে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণের আবশ্যকতা অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে।

মিলনমন্ত্র সাধনের জন্য, শান্তি সংস্থাপনের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যাণের জন্য উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের দীপ্ত দীপ সমুজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, গুরুবাদের সহিত, সম্প্রদায়ের চরণে সম্পূর্ণ পরাধীনতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব, শতবিধ দুর্নীতি অনাচার ও কদাচারের সহিত অন্তরের সদ্ভাবের দ্বন্দ্ব যখন দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে ভগবৎপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজেরই ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার এই যে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ দ্বন্দ্ব আমাদের শান্তিময় দেশে চতুর্দ্দিকে অশান্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছে, আমার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিলে; যে নামেই অভিহিত কর না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক সত্য অন্তরে গ্রহণ না করিলে এবং তাহা বলের সহিত কথায় ও কার্য্যে প্রচার করিতে না পারিলে এই দ্বন্দ্বের বীজ মরিবে না, চিরন্তন শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, দেশে কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। দেশে ও সমাজে যতদিন রাশি রাশি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে থাকিবে, শতবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে থাকিবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ববিবাদের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং ততদিন অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ ধরিয়া থাকিবার জন্য, এবং জগতের সকল কার্য্যে মঙ্গলবিধাতা ভগবানের

মঙ্গলহস্ত দেখাইবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের মত সত্য-ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মসমাজের প্রয়োজন অনিবার্য্য।

এই অসাম্প্রদায়িক আদর্শ দেখাইতে গেলে, জগতের সকল কার্য্যে বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেখাইতে গেলে, ব্রহ্মোপাসকদিগের শুধু কথায় অসাম্প্রদায়িকতা বা ভগবানের মঙ্গলভাব প্রচার করিলে চলিবে না। ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই, নিজ নিজ কার্য্যের ভিতর দিয়াও, উহা সমস্ত বলের সহিত প্রচার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ ও বিফলপ্রয়াস হইবার অন্যতর কারণই হইল, কথায় ও কার্য্যে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল না থাকা, এবং সেই কারণে, হৃদয়ের সমস্ত বলের সহিত সত্যধর্ম্ম ও তদবলম্বিত সত্যসকল প্রচার করিতে না পারা। যাহা অন্তরে সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা যেমন কথায় প্রচার করিতে পরাংমুখ হইব না, সেইরূপ তাহা কার্য্যেও পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত অবধি ব্রাহ্মসমাজ তো এই কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য ও নেতাগণও নিজ নিজ জীবনের দ্বারা এই সত্যেরই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই উহার তেজ সমগ্র জগতে এত শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন সমাজই—ধর্ম্ম-সমাজই বল, গার্হস্থ্য সমাজই বল, আর রাজনৈতিক সমাজই বল—কেবল মুখের কথায় উন্নতির পথে জীবনের পথে স্থির থাকিতে পারে না। যে সমাজ মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিবে, সে সমাজকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। শুধু কথায় কিছু হইবে না, কাজ চাই—এই সত্যবাণী আজ কিছুকাল যাবৎ ভারতবাসী জনসাধারণের অন্তরে বড়ই বেশীরকম আলোড়িত হইতেছিল এবং বাহিরে তাহা প্রকাশ লাভ করিতে চাহিতেছিল। তাই না সেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখে ভগবৎপ্রেরণায় এই বাণী ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল যে, এখন আর আমাদের "কথায় কাজ নাই, কাজের কথা চাই"। এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ এই যে, আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল চাই—কথায় যে সত্য প্রচার করিব, কার্য্যেও তাহাই পরিণত করিব। এই মন্ত্র সভাপতি মহাশয় রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে প্রয়োগ করিলেও আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ও বলিতে চাই যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই মন্ত্র ভারতবাসী সকল ব্যক্তির ও সকল সমাজেরই হৃদয়ের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সকল সমাজেরই অন্তরের কথা হইয়াছে বলিয়াই আজ কঠোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজও নির্য্যাতিত রমণীকে সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের আশীর্ব্বাদ সঞ্চয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি যথার্থই আমাদের প্রিয়বস্তু হয়, ব্রাহ্মসমাজকে যদি বাঁচাইয়া রাখা আমরা আবশ্যক মনে করি, তবে আমরা প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসককেও সনির্বন্ধ অনুযোগ করিব যে 'কথায় আর কাজ নাই; রাশি রাশি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া এখন আর বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না; এখন কাজের কথা চাই; এখন সত্যধর্ম্মকে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করা চাই; ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্রকে কৌস্তুভমণির ন্যায় অন্তরে ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দুঃখ-দুর্দিনের বিরুদ্ধে, দেশের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের বিরুদ্ধে, জাতির অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া চাই'। আমাদের মুখের কথার সহিত কাজের মিল হওয়া চাই। মুখে এক সত্য প্রচার করিব, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ভীরু কাপুরুষের ন্যায় রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না।

অমঙ্গল, অসত্য, অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি বিজয় লাভ করিয়া বিজয়ীর বেশে দাঁড়াইতে চাও—তাহা যদি তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, প্রাণের লক্ষ্য হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই অমোঘ বীজমন্ত্রের ন্যায় অন্য কোন কিছুকেই সহায়রূপে পাইবে না। সেই অমোঘ সংকটমোচন বীজমন্ত্র হইতেছে—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" সেই ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা। এই বীজমন্ত্র যে কিপ্রকার অসাম্প্রদায়িক, তাহা কাহাকেও বুঝা-

ইহা দিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে বলিয়া মনে করি না। এই বীজমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার স্বতঃসিদ্ধ অসাম্প্রদায়িকতা অন্তরে সহজেই প্রতিভাত হইবে। ইহার ন্যায় অসাম্প্রদায়িক ও উদারতম বীজমন্ত্র অন্য কোন ধর্ম্মে অন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া জানি না। এই বীজমন্ত্র উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কারণেই ব্রহ্মোপাসকের হস্তে এক অব্যর্থ অস্ত্র—ইহা সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার অধিকার রাখে।

যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে দেশ এই উদার ও অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র অন্তরে ধারণ করিবে—শুধু কথায় নয়, কিন্তু কাজেও—সে ব্যক্তি, সে সমাজ, সে দেশ হইতে সঙ্কীর্ণতা এবং তাহার অনুষঙ্গী দুঃখদৈন্য, অশান্তি নিরাশা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের নিদানসকল যে নিশ্চয়ই দূরে সরিয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের হিন্দুসমাজ এক সময়ে এই অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আশ্চর্য্য সত্যবাণী এদেশেই প্রকাশ পাইয়াছিল—"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" সমুদ্র যেমন নদনদীসমূহের একমাত্র গন্তব্যস্থল, ভগবানও সেইরূপ সকল মানবেরই একমাত্র গম্যস্থল। এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইবার ফলে যখন হিন্দুসমাজ কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সকল বিষয়েই শতধাবিভক্ত হইয়া শতবিধ সঙ্কীর্ণতার শত শত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর পাশজালে আপনাকে আবদ্ধ করিল, যখন হিন্দুসমাজ মুখে উদারতার বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলেও কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল, তখনই সেই উন্নত ও সুবিস্তৃত হিন্দুসমাজ অবনতির পিচ্ছিল পথে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের, রাজনীতিকে সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার ফলেই আজ হিন্দুমুসলমানের এই ভীষণ বিরোধ। সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া সমাজগঠনের চেষ্টার ফলেই আজ হিন্দু জাতি ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই প্রকার মুখে উদারতার উৎস ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা ব্রহ্মোপাসকগণ ন্যূনাধিক বলের সহিত প্রচার করিলেও, কার্য্যে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ করিবার ফলেই, ব্রাহ্মসমাজ আর প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না—ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, মনে হয় যেন, একটু পিছাইয়া পড়িতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি আবার জাগাইয়া তুলিতে চাই, হিন্দুসমাজকে যদি আবার ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে চাই, সমগ্র ভারতবাসীকে যদি আবার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির সমুচ্চ শিখরে দাঁড় করাইতে চাই, তবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, প্রত্যেক হিন্দুকে, প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসককে নির্ভয়ে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্ববিধ অন্যায় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে; সংসারের সকল ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার সকল বিভাগে সেই অপরাজিত দেবতার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের অজেয় পতাকার বিজয়-ঘোষণা করিতে হইবে।

নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ভগবানের মাভৈঃ বাণী আকাশের প্রত্যেক অংশ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। সেই বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাবে, তাঁহার অমিত শক্তিতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে; সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দবিধানে যদি আমাদের প্রকৃত আস্থা থাকে, তবে সংসারের ভয়প্রদর্শনে, সমাজের নিষ্পীড়নে আমাদের সত্যধর্ম্মপ্রচারে পরাংমুখ হইবার কোন অবকাশই নাই। ঋষিদের অন্তরে এই বিশ্বাস অটল অচল ছিল বলিয়াই তাঁহারা বড়ই বলের সহিত ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না। দুর্ব্বলতাই ভয়ের কারণ। দুর্ব্বল যে, সেই সংশয় করিতে পারে যে, সত্যধর্ম্ম প্রচারের ফলে প্রাচীন চিরপরিচিত সমাজ যদি ভূমিসাৎ হয়, তবে কি হইবে? যথার্থ প্রাণের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করা, কথায় ও কার্য্যে একমিল হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার করা

দুর্ব্বল ভীরু সংশয়াত্মার কর্ম্ম নয়। যথার্থ প্রাণের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করা—স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাদৃপ্ত, ধর্ম্মের নামে অনাচারনিরত উদ্ভ্রান্তচিত্ত মানবের কার্য্য নয়। তাহার বিকৃত দৃষ্টি দেখিতে পায় না যে, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া মঙ্গলবিধাতা ভগবানের মঙ্গলহস্ত এক আশ্চর্য্য মঙ্গলসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে। প্রকৃত সত্যধর্ম্ম প্রাণের সহিত প্রচার করিতে গেলে, সৎসাহস চাই, ধৈর্য্য চাই, সহিষ্ণুতা চাই, একনিষ্ঠা চাই।

আজ এই উৎসবের পবিত্র দিবসে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে নূতন কথা কি-ই বা বলিব? পুরাতন কথাই বারম্বার পুনরুক্ত করিতে চাই। সত্যধর্ম্মের নামে নিত্য নূতন মতবাদ প্রচার করিয়া নব নব সম্প্রদায়সৃষ্টির অবকাশ দিও না; কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের নিকট বল ও উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া যথার্থ সত্যধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হও। নিত্য নূতন আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া নব নব জাতিসৃষ্টির অবকাশ দিও না; কিন্তু নিজ নিজ সমাজের আচার ব্যবহার হইতে ভাল অংশ গ্রহণ করিয়া এবং মন্দ অংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্য-ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমাজগঠনের ব্যবস্থা কর। এই প্রকার কথা ও কার্য্যের মধ্যে মিল রাখিয়া চলিলেই, জীবনের সকল কার্য্য সকল বিভাগ সত্যধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত রাখিলেই ধরাধাম স্বর্গধামে পরিণত হইবে। এইপ্রকার সঙ্ঘবন্ধন বা সমাজগঠনের প্রারম্ভে অল্পসংখ্যক লোক তোমার সহায় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নিরাশায় মুহ্যমান হইও না। মনে রাখিও যে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেয় আমাদিগকে আপাতমধুর নানা বিষয়ের লোভ দেখাইয়া আকর্ষণ করিতেছে। ইহা সত্বেও তুমি যে ঐ অল্পসংখ্যক লোককে তোমার সহায়রূপে পাইয়াছ, তাহারই জন্য ভগবানের চরণে মস্তক অবনত করিও। তুমি স্থির জানিও যে, সকল স্বাধীনতার উৎস সেই স্বাধীন অমৃতপুরুষের সন্তান তুমি—তুমিও বীর, তুমিও সবল। সেই অমৃতপুরুষের অনিমেষ মঙ্গল-দৃষ্টিতে স্বীয় দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ রাখিয়া মানুষের ভালমন্দ বলার উপর, মানুষের নিন্দাপ্রশংসার উপর কিছু-মাত্র নির্ভর করিও না, ভ্রূক্ষেপ করিও না। প্রতি নিমেষে অন্তরে কাণ পাতিয়া শোন যে, অন্তরের গুরু তোমাকে কোন্ পথে যাইতে আদেশ করেন। সেই আদেশ শুনিয়া সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও—মানুষের ভয়ে, সংসারের ভয়ে সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। সংসারের নিকট যতই আঘাত পাইতে থাকিবে, ততই সেই ভক্তবৎসল ভগবানের চরণ আরও বলের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিও—দেখিবে, সকল বিপদ আপদ নিরস্ত হইয়া শান্তি ও সুখ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তোমার হৃদয় হইতে ভগবানের নামে নিত্য এই জয়ধ্বনি উঠিতে থাকিবে—জয় ভগবানের জয়।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

মিশ্রভৈরব—চৌতাল।

করুণার সাগর, কৃপাজল দেও হে কাতরে।
কোথা তুমি ত্রিভুবনরাজা পাবনের পাবন,
কোথায় দীন হীন অকিঞ্চন আমি।
যার গুণে পাষাণ-হৃদয়ে
দেখা দেয় প্রেমের অঙ্কুর,
ডাকি তারি তরে।
তব প্রসাদ-বারি বরিষে যথা,
জীবন-ধন শান্তি-রস উথলে তথ সহস্র ধারে।

কথা—৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—৺প্রতিভা দেবী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সঃ II মঋা -া । সণ্সা ণ্দা । -া ন্সা । -ন্সজ্ঞা -া । জ্ঞপমপা মজ্ঞা । -া জ্ঞরা I
ক রু ০ ণা·০ র০ ০ সা০ ০০০ ০ ণ০০০ র ০ রু০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মজ্ঞা -ঋসা । সণ্সা ণ্দা । ন্া -সা । সন্সা -া । সঋা -া । সন্সাঃ সঃ II
পা ০০ জ০০ ন০ দা ও হে০০ ০ কাত ০ রে০০ "ক"

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মঃ II ণদা -া । না -র্সা । র্সা র্সর্সা । -নর্সা র্সর্সা । র্সা -নর্সা । র্সা -া I
কো থা ০ তু ০ মি, ত্রিভু ০০ বন রা ০০ ঋা ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সাঃ র্সঃ । র্সা -নর্সর্সা । র্সা -নর্সর্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা । -র্সণর্সা ণদা । -া পমপা I
পা ব নে ০০র পা ০০০ ব ০ ০০০ ন০ ০ কো০০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মজ্ঞা -ঋা । -সা সসা । সজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞমা পমপা । মজ্ঞমা জ্ঞা । -ঋা সসা II
থা ০ ০ দীন হী নঅ কি০ ঞ্চ০০ ০ন আ ০ মি "ক"

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II পাঃ -পঃ । পা পা । -া পা । পদমা -পা । পপা পর্সণর্সা । ণদা -া I
যা র ভু বে ০ পা যা০ ০ পদ্ম দ০০ য়ে০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I দপা -ণদা । পমপা মজ্ঞা । -া জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞপা পমপা । মজ্ঞা মজ্ঞা । -ঋা সা I
দে০ ০০ খা০০ দে০ ০ য়,প্রে মে০ র০০ অ০ ভু০ ০ র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I সণ্া -সা । সা সজ্ঞা । -া জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞরা -মা । -জ্ঞা -মজ্ঞা । -ঋা -সা I
ভা০ ০ কি তা ০ রি,ত রে০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মা মমা । পদাঃ দঃ । মা -র্সা । র্সনর্সা র্সর্সা । র্সাঃ র্সঃ । র্সা নর্সর্সা I
ত ব,প্র সা দ বা ০ রি,০০ বরি ষে ব থা ০০য

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I নর্সর্জ্ঞা -র্ঋা । র্সা ণদা । দা পণা । দা দপা । পা পা । পা পপা I
থা,০০ ০ জী ব০ ন, ধ ন, শা০ ন্তি র স, উথ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মপা -মজ্ঞজ্ঞা । মজ্ঞা -ঋা । -সা সসা । সজ্ঞা -মজ্ঞা । জ্ঞপা -মদপা । মজ্ঞা -ঋসা II II
লে, ০০ত থা ০ ০ সহ ব্র ০ ধা০ ০০০ রে "০ক"

ব্রাহ্মগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

রেলের গাড়ির ইঞ্জিনে যখন নূতন কয়লা দেওয়া হয়, তখন তাহার চিমনি হইতে একটা অতি গাঢ় কাল বর্ণের ধূম নির্গত হইয়া প্রথমে একটি স্তম্ভাকারে উঠিতে থাকে। তৎপরে উহা যতই উপরে উঠিতে থাকে ততই ঐ ধূম ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে অনন্ত আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন।

প্রথমে যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম স্তম্ভাকারে উঠে, তাহাতে কয়লার ময়লা থাকে এবং ক্রমে যতই ঐ ময়লা ঝরিয়া পড়িতে থাকে ততই ঐ ধূমের বর্ণ ও গাঢ়তা পাতলা হয় এবং উহা আকাশ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ময়লা বা আবর্জ্জনাপূর্ণ প্রথম ধূম আপনাকে পৃথক রাখিতে চেষ্টা করে। পরে ময়লা যতই পরিষ্কার হইয়া যায় অর্থাৎ উহা যতই নির্ম্মল হইতে থাকে ততই উহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া যায় এবং চতুষ্পার্শ্বের আকাশের সহিত মিলিত হইবার স্পৃহা বাড়িতে থাকে এবং যখন ঐ ধূম আবর্জ্জনাশূন্য অর্থাৎ স্বচ্ছ হয়, তখন উহা সমস্ত আকাশের সহিত এমন মিলিয়া যায় যে উহার অস্তিত্ব আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

মানুষেরও এই অবস্থা। যখন সে নবজীবন লাভ করে, চারিদিক হইতে সংসারের নানা আবর্জ্জনা বা মলিনতা আসিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সে সেই সংকীর্ণতাপূর্ণ মলিনতার বশীভূত হইয়া আপনাকে পৃথক রাখিতে ইচ্ছা করে। পরে এই মলিনতা যতই দূর হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয়ে উদারতা জাগ্রত হয়—সে চারিদিকের লোককে—চারিদিকের বস্তুকে প্রেমের দ্বারা আপনার করিতে চেষ্টা করে এবং অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার প্রেমের সীমার অন্তর্ভূত করিয়া লয়। ইহাকেই বিশ্বপ্রেমের বিকাশ বলে। যখন এই বিশ্বপ্রেম হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়, তখন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়ে, তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়—সে সেই অনন্ত অসীমের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে থাকে

বড় হতে চাই না আমি
ছোট করে দাও হে আমায়।
আমি ধূলাতে মিশায়ে রব
তৃণ হতে কোমল হব
ভক্তজনপদধূলি মাখিব হে গায়।
আমার অহঙ্কার চূর্ণ কর
ভেঙ্গে দাও হে খেলার ঘর
আমার বাসনা নিভায়ে দাও ওহে দয়াময়।
সংসার বিষ আকাংক্ষা
মনে বড় দেয় শঙ্কা
কৃপা করে কৃপাময় দাও হে অভয়।

তখন সে অমল বিমল হৃদয়ে সেই অনন্ত অসীমের দিকে, সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ক্রমে আপনার বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা বিশ্বসংসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্বপাতাকেও সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া ফেলে। তাহার প্রেমরূপী গঙ্গা তখন অনন্ত প্রেমের সাগরের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে তাহার আর স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। ইহাকেই মুক্তি কহে। যাঁহারা এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম। যে সমাজ এই অবস্থা প্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দেয়—যে সমাজ মনুষ্যকে ঐ পথের পথিক হইবার সাহায্য করে, সেই সমাজের নাম ব্রাহ্মসমাজ। এই উচ্চ আদর্শ লইয়াই আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ অবতীর্ণ হইয়াছে।

মনুষ্যমাত্রেই মুক্তির প্রয়াসী। তাহারা নিজ নিজ জ্ঞানশক্তির দ্বারা মুক্তির পথে পরিচালিত হইতে চায়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সকল ইচ্ছারই পরিসমাপ্তি ব্রহ্মে, সকল ধর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি সেই একমেবাদ্বিতীয়মে। সংসারের মলিনতা এই পথের কণ্টক। এই মলিনতাই মানুষকে তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেয় না। এই মলিনতাই তাহাকে মুক্তির পথ হইতে দূরে লইয়া যায়। সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই এই মলিনতাকে বর্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং"

আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে সেই বিশুদ্ধাত্মা পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। যাহার হৃদয়দর্পণ স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যাহার হৃদয়রূপ দর্পণ যত মলিনতাপূর্ণ হয়, তাহার পক্ষে তাঁহাকে দেখা ততই কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হয়।

একখানি স্বচ্ছ বিমল দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াও, তোমার প্রতিবিম্বটি অতি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ঐ আয়নার উপর কিছু ধূলিকণা নিক্ষেপ কর—প্রতিবিম্বটি তত পরিষ্কার দেখিতে পাইবে না। উহার উপর কিছু কর্দ্দম লেপন কর—প্রতিবিম্বটি আরও অস্পষ্ট দেখিবে। একলেপ আলকাতরা লাগাইয়া দাও আরও অধিক অস্পষ্ট দেখিবে। পুনঃ পুনঃ আলকাতরার লেপ লাগাইয়া দাও আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ মানবহৃদয়ে প্রথমে ধূলিকণার ন্যায় সামান্য আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে, পরে ক্রমে ঐ ধূলিকণা কর্দ্দমে পরিণত হয়, ক্রমে আলকাতরার দাগ লাগে। তার পর পোঁচের উপর পোঁচের দ্বারা এমন একটা কঠিন আবরণ পড়িয়া যায় যে, তাহার মধ্য দিয়া ভগবানের প্রতিবিম্ব দর্শন করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু ভগবানের এমন দয়া, তিনি আমাদের হৃদয়কে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে তাহার মলিনতা যতই কঠিন হউক না কেন, একেবারে দুরপনেয় নহে। চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সাধুসঙ্গের দ্বারা, এই মলিনতা দূরীভূত করিতে পারা যায়। তবে হৃদয়ের মলিনতা যতই কঠিন হয় তাহা অপনোদন করাও ততই কষ্ট এবং সাধনা-সাধ্য হয়। যেমন কাচময় দর্পণের ধূলিকণা সামান্য ঝাড়িলেই পরিষ্কার হয়, কর্দ্দম জল দ্বারা ধৌত করিলেই চলিয়া যায়, কিন্তু আলকাতরার লেপ যতই ঘন হয় ততই তৈল ও নারিকেল ছোবড়া দ্বারা ঘসিতে হয়, সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়ের মলিনতাও দূর করিতে পারা যায়। কিন্তু করে কে?

ব্রাহ্মসমাজ মানুষের হৃদয় হইতে মলিনতা দূরীভূত করিবার জন্যই অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মলিনতা দূর করিয়া দিয়া মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যাওয়াই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সাধনা। আজ এই শুভ মাঘোৎসবের দিনে, বৎসরের শেষে হিসাব নিকাসের দিনে, শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ একবার দেখুন, ব্রাহ্মসমাজকে আপনারা এই উদ্দেশ্যে কতদূর সফল করিতে পারিয়াছেন। আপনারা কত মলিন পঙ্কিল হৃদয় পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন; আপনাদের হৃদয় কতদূর মলিনতাশূন্য হইয়াছে, আপনাদের প্রেম কতদূর পরিস্ফুরিত হইয়াছে।

যাহার নিজের হৃদয় মলিনতাপূর্ণ, সে কখনও অপরের হৃদয় হইতে মলিনতা দূর করিতে সক্ষম হয় না। ধূলামাখা কাপড়ের দ্বারা আর্সির ধুলা ঝাড়া যায় না, কাদামাখা ন্যাতার দ্বারা কাদা দূর করা যায় না, আলকাতরামাখা ব্রুষের দ্বারা আলকাতরার দাগ নষ্ট হয় না। কিন্তু একটি নির্ম্মলহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের হৃদয় মলিনতাশূন্য করিতে পারেন।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের পবিত্র জীবন, পবিত্র প্রেম, সকলের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। এমন কি, যাঁহারা সে সময় ব্রাহ্মসমাজের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারাও ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাই আজও রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রমুখ মনীষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিকট আদরণীয় হইতেছেন। সেই এক দিন আর এই এক দিন।

আজ আমি যখন ব্রাহ্মসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন যেন আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। যদিও ইহা একটি অপ্রিয় সত্য, তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, আজ আমাকে এই সকল কথা বলিতে হইতেছে। আশা করি সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আজ আমি দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে সেই উচ্চ আদর্শ, ব্যক্তিগত ব্রাহ্ম জীবনের সেই মহৎ আদর্শ যেন অনেক নীচে নামিয়া পড়িতেছে। অনেক ব্রাহ্ম পরিবার অনেক ব্রাহ্ম-

সন্তান যেন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ লইয়া অনেকে, অনেকে কেন; সকল সম্প্রদায়ের লোক উন্নতির পথে উত্থিত হইয়াছিল, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শচরিত্র ব্যক্তিগণের সন্তানগণ যেন স্বর্গভ্রষ্ট রাজা নহুষের ন্যায় দ্রুতবেগে নীচের দিকে নিপতিত হইতেছে। অনেকে স্বীকার করুন বা না করুন, ইহা একটি ধ্রুব সত্য। ব্রাহ্মগণ একবার চক্ষু মেলিয়া যদি দেখেন, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অধঃপতনের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। যাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মসমাজ অনেক আশা করিযাছিল, যাঁহাদের মুখের দিকে ব্রাহ্মসমাজ এখনও সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বার্দ্ধক্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহারা আজ সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং স্বার্থের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখনও যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে নব জীবন আনিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সহানুভূতির অভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

হে ব্রাহ্মগণ! আজ একবার তোমরা বুকে হাত দিয়া বল দেখি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তোমাদের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্ত্তমান আছে কি? ব্রাহ্মসমাজের জন্য তোমাদের প্রাণ পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদে কি না? রাজা রামমোহন রায়ের অতুল কীর্ত্তি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র এই আদিব্রাহ্মসমাজের জীর্ণ মন্দিরটির প্রতি একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন দেখি। বিনা সংস্কারে ইহা আর কত দিন থাকিতে পারে? এত দিন যে ইহা ধূলিসাৎ হয় নাই, তাহা কেবল ভগবানের দয়া মাত্র। আর কিছু দিন এই ভাবে থাকিলে ইহার দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ ইহা পুরাবৃত্তের অতীত-স্মৃতির নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। বল দেখি ভাই কয়জন ব্রাহ্মের হৃদয়ে ইহার জন্য এক বিন্দুও অশ্রুকণা সঞ্চারিত হইয়াছে?

কথাটা আদিব্রাহ্মসমাজ লইয়া বলা হইল মাত্র, কিন্তু ইহা অল্পবিস্তর সকল সমাজের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। মফঃস্বলের সমাজের ত কথাই নাই। মফঃস্বলের অনেক মন্দির এখন জীবজন্তুর আশ্রয়স্থান রূপে পরিণত হইয়াছে। ফল কথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মগণের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তত শ্রদ্ধা ভক্তি ও আগ্রহ দেখা যায় না; ব্রাহ্মসমাজের জন্য ব্রাহ্মদের প্রাণ আর পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদে না, পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুল হয় না। ইহার কারণ কি? আমরা এখন ব্রহ্মের পবিত্র আসনে স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি! বিশুদ্ধ প্রেমের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের পূজার পুরোহিত করিয়াছি!

অনেকে এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের এখন আর আবশ্যকতা নাই! ইহা কি সত্য? আমার বিশ্বাস, দেশের—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইযাছে। যাহারা অন্ধ, তাহারাই ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা দেখিতে পায না। ব্রাহ্মসমাজ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসমাজ। ইহা এক জাতি, এক সম্প্রদায় বা এক দেশের সমাজ নহে। ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠিত। গৃহপ্রেম যে বিশ্বপ্রেমের মূল অনেকে তাহা ভুলিয়া যান। এই গৃহপ্রেমের বিস্তারই বিশ্বপ্রেম। নিজের গৃহকে উচ্ছেদ করিলে, আপন ব্যক্তিকে অনাহারে মারিলে, প্রকৃত প্রেম প্রকাশ পাইতে পারে না। বিশ্বপ্রেম নিকট হইতে উত্থিত হইয়া, নিকটকে সঙ্গে লইয়া দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া, সমগ্র বিশ্বসংসারের অণুপরমাণুর উপর সমভাবে ব্যাপ্ত হয়। বিশ্বপ্রেম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারে না। আপনার দেশ, আপনার জাতি, আপনার আত্মীয়স্বজন, আপনার সমাজকে অন্ধকারের নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া দূরের অন্ধকার দূর করিতে যাওয়া দূরদর্শীর কার্য্য নয়। ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বপ্রেমের তরণী। আমার বিশ্বাস, যেদিন জগত হইতে এই সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম চলিয়া

যাইবে সেদিন জগত শ্মশানে পরিণত হইবে, মহাপ্রলয়ের ধ্বংসকারিণী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকিবে।

আজ তাই এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৎসরান্তে আবার এই কাতর প্রার্থনা লইযা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মগণ আবার জাগ্রত হও, আবার স্বার্থ, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বাহির হইয়া ভায়ে ভায়ে ভগ্নীতে ভগ্নীতে পবিত্র বিমল প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, জীবন সার্থক কর। একবার আত্মপর ভুলিয়া সমস্ত জগৎকে আপন বক্ষে স্থান দিবার জন্য ক্রোড় প্রসারণ কর। চারিদিকে আবার এই সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের ভেরীধ্বনি আকাশভেদ করিয়া উত্থিত হউক। সকল সমাজ মিলিয়া, সকল প্রাণ মিলিয়া আবার একতানে গাইয়া উঠ—

গাও রে আনন্দে সবে
জয় ব্রহ্ম জয়।

ভট্টনারায়ণপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১২০। ভট্টনারায়ণের সাধারণ পরিচয়।

বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা কুলগ্রন্থসমূহের যে সকল কারিকা উদ্ধৃত দেখি, তন্মধ্যে অধিকাংশ কারিকাতে ভট্টনারায়ণ ও তাঁহার বংশের মহিমা সুকীর্ত্তিত দেখি। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সমানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ কিছু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্রও আমাদের এই অনুমান সমর্থন করিয়া বলেন যে, পাঁচ গোত্রের যে পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিযাছিলেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মুনিশ্রেষ্ঠই মান্যতম হইযাছিলেন (১)। বাচস্পতি মিশ্র ভট্টনারায়ণকে "কবি" (২) ও "লোকবিখ্যাত" (৩) বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। প্রেমবিলাসে ক্ষিতীশের সাত পুত্র উক্ত হইয়াছেন (৪); কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবে ক্ষিতীশের ভট্টনারায়ণপ্রমুখ "বেদবিশারদ" পঞ্চপুত্রের উল্লেখ আছে (৫)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে "কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাব ক্ষিতীশনামক নরেন্দ্রপুত্র" বলা হইয়াছে (৬)। ভট্টনারায়ণ রাজপুত্র ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে মনে হয় যে তিনি বেশ একটু ধনবান ছিলেন, এবং সেই সূত্রে "ক্ষিতীশ" শব্দের অর্থ ধরিয়া তাঁহাকে "নরেন্দ্র"-পুত্র বলা হইয়াছে। এড়ুমিশ্র এবং মহেশ তাঁহাকে "মুনি" বলিয়াছেন (৭)। মহেশ বলেন—ভট্টনারায়ণ বেদবিদ্যাকে কাহা অপেক্ষাও হীন ছিলেন না, এবং সামবেদে বিশ্রুতগৌরব ছিলেন (৮)। তিনি যজ্ঞনিপুণ এবং তিন বেদে পারদর্শী ছিলেন (৯)। সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ একটু তেজস্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে—যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা পঞ্চব্রাহ্মণকে দীক্ষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া যখন স্বরাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন উত্তরের জন্য সকলে ভট্টনারায়ণেরই মুখের দিকে তাকাইযা রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ইঙ্গিতে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রাজা বহু সৌধাদির দ্বারা পুরপঞ্চক গড়িয়া তুলিলে তাঁহারা সেখানে এক বৎসরকাল বাস করিলেন। পরে ভট্টনারায়ণের নানা কার্য্যে লোকাতীত ক্ষমতা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে কয়েকটী গ্রাম দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী ভট্টনারায়ণ যজ্ঞান্তে যথারীতি দক্ষিণাস্বরূপে গ্রাম বা ধনরত্ন গ্রহণ করিলেও রাজার অনুগ্রহদানস্বরূপে কোন গ্রাম লইবার অক্ষমতা জানাইয়া কিছু-না-কিছু মূল্য দিয়া সেই গ্রাম ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন (১০)। এরূপ কথা পঞ্চব্রাহ্মণের অন্য কোনও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উঠে নাই, এবং বোধ হয়, ভট্টনারায়ণের মানসিক তেজস্বিতা সম্বন্ধে কোন-না-কোন প্রকার কিম্বদন্তী না চলিয়া আসিলে তাঁহার সম্বন্ধে এ প্রকার কথার প্রতিধ্বনিও উঠিতে পারিত না।

১২১। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ।

শাণ্ডিল্যগোত্রে দ্বিতীয় বেদব্যাসতুল্য কলিব্যাস নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বামদেব; তাঁহার পুত্র মহাদেব;

---

(১) ব্রা৹ কা৹ ১০০ পৃঃ
(২) ব্রা৹ কাঃ ১০২ পৃঃ। (৩) স৹ নি৹ ৫০০ পৃঃ।
(৪) প্রে৹ বি৹ ২৬৩ পৃঃ। (৫) কু৹ তঃ ৮৭ শ্লোক।
(৬) ক্ষি. ব৹৪ পৃঃ।
(৭) স৹ নি৹ ৫০০ পৃঃ।
(৮) স নি৹ ৫০৬। (৯) স৹ নি৹ ৫০৭।
(১০) [৹ ব৹ ৪ পৃঃ।

তাঁহার পুত্র ক্ষিতীশ। মুদ্রিত কুলতত্ত্বার্ণবে, বামদেবের পুত্র ক্ষিতীশ এবং ভট্টনারায়ণকে ক্ষিতীশের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিযা উল্লেখ আছে। এই ক্ষিতীশ (সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি) গৌড়ে আসিযাছিলেন (১১)। কলিব্যাস সম্ভবত তাঁহার সমযে একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাস বলেন, ক্ষিতীশের সাত পুত্র—দামোদর, ভট্টনারায়ণ, শৌরি, শঙ্কর, বিশ্বম্ভর, লোকারণ্য ও হিরণ্য (১২)। হরিমিশ্র বলেন—ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত অনেক পুত্র জন্মিযাছিলেন—দামোদর, শৌরি, মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকবিখ্যাত শঙ্কর এবং ভট্টনারায়ণ (১৩)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত ভট্টনারায়ণ, দামোদর, বিশ্বেশ্বর, মহামতি শৌরি এবং লোকবিখ্যাত শঙ্কর ১৪)। বাচস্পতি মিশ্রও ক্ষিতীশের ৫ পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৫)। তন্মধ্যে মহেশ্বর তাঁহার কুলপঞ্জিকায় (১৬) বলেন যে, দামোদর বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারাযণ রাঢ়ী হইয়াছিলেন। এড়ুমিশ্র কুলপঞ্জিকা সমর্থন করিয়াছেন এবং বলেন যে ভট্টনারায়ণ আনুগঙ্গ প্রদেশ দেখিয়া সহযোগী চারজনের সঙ্গে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন।

১২২। পঞ্চব্রাহ্মণ সাতশতী কন্যা বিবাহ করেন কি না?

কাহারো কাহারো মতে পঞ্চব্রাহ্মণ অতিরিক্ত আনুগঙ্গ পঞ্চগ্রাম পাইবার পর বঙ্গদেশে বসতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের পূর্ব্ববাসিন্দা সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় আছে যে, রাজা ভাবিলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণের স্কন্ধে সাতশতী কন্যা চাপাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা আর এদেশ ছাড়িযা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না। ইহা ভাবিয়া তিনি সাতশতী ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চব্রাহ্মণের করে কন্যা সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা সানন্দে পঞ্চব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিলেন এবং পঞ্চব্রাহ্মণ সাতশতীকন্যাগণের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন। ইহা অবশ্য সম্ভবপর এবং নুলো পঞ্চানন আমাদের এই অনুমান সমর্থন করেন যে, উত্তরকালে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানেরা সাতশতী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহাদির দ্বারা অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিলেন (১৭)। কিন্তু সাতশতী কন্যা দিয়া পঞ্চব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া রাখিবার আখ্যায়িকা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় (১৮)। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিযাছি যে পঞ্চব্রাহ্মণ যখন বঙ্গে আসেন, তখন শ্রীহর্ষের বযস ৯০ বৎসর, ভট্টনারাযণের বয়স ৮০ বৎসর এবং বেদগর্ভের বযস ৬০ বৎসর। যাহাঁরা জীবনের শেষ ভাগে আসিয়া পরলোকের সম্মুখে দণ্ডাযমান এবং যাহাঁদের নাম সমস্ত কুলগ্রন্থে একবাক্যে সম্ভ্রমের সহিত ঋষিকল্প, মুনি প্রভৃতি বিশেষণসহ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের প্রলোভনে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া আবদ্ধ থাকিবার আখ্যায়িকা কেবল অসম্ভব নহে, কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর এবং রচয়িতার সহজজ্ঞানের অভাবের সম্যক পরিচয় (১৯)। তবে উত্তরকালে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণ যে সাতসতী কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নুলো পঞ্চাননের কারিকা হইতে অনুমিত হয় (২০)।

১২৩। এবিষয়ে যুক্তি ও খণ্ডন।

এ বিষয়ে কুলপঞ্জিকাকার যে স্বপক্ষে কাহাকেও পান না তাহা নহে। যাঁহারা তাহাকে সমর্থন করেন, তাঁহাদের দুইটী প্রধান যুক্তি শোনা যায়। তাঁহাদের প্রথম যুক্তি এই যে, বঙ্গদেশে

(১১) ব্রা॰ কা॰ ১৩ পৃঃ; কুলরমা—স॰ নি॰ ২৯১-২ পৃঃ।
(১২) প্রে॰ বি॰ ২৬৩ পৃঃ।
(১৩) ব্রা॰ কা॰ ১০৩ পৃঃ। (১৪) কু॰ ত॰ ২৫০৫১ শ্লোক
(১৫) স॰ নি॰ ৫০০। (১৬) স॰ নি॰ ৫০০।

(১৭) স॰ নি॰
(১৮) সং নি॰। বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই যুক্তি বিভিন্ন প্রণালীতে খণ্ডন করিয়াছেন।
(১৯) পঞ্চব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহেশ্বর বল্লালসেনকে বলিয়াছিলেন —
তাঁরা সাগ্নিক দ্বিজ, চন্দন বিষ্ঠা সম।
আর ষড়ৈশ্বর্য্যে ধনী, ইন্দ্রিয় সংযম ॥ ৩০
উঁদের সাধ ছিল দাসের পরিপাকে।
জগৎ কুটুম্বী, আত্মবৎ ভাবে যাকে তাকে ॥ ৩১
গোষ্ঠীকথা স॰ নি॰ ৫৮৭ পৃঃ
(২০) কান্যকুব্জ তেজীয়ান হয় সাতশতী।
মূর্খ নিন্দুক দেখুক, তায় কি যে ক্ষতি ॥
সাতশতীর প্রভা কান্যকুব্জের আভা।
মণি কাঞ্চনদিভা স্ফটিকে জবাশোভা ॥
নুলো পঞ্চাননের ২য় কারিকা স॰ নি॰ ৩৬৭

(ক) বঙ্গদেশে সামবেদীর প্রসার।

সপ্তশতীরাই একমাত্র সামবেদী ছিলেন (২১); পঞ্চব্রাহ্মণ বিভিন্ন বেদী হইলেও তাঁহাদের সন্তানেরা উত্তরকালে কেবলমাত্র সামবেদী হইলেন কিপ্রকারে? নিশ্চয়ই মাতুল সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে (২২)। এই যুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে দাঁড়াইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আমরা পঞ্চব্রাহ্মণ কোন্ বেদী আলোচনা করিবার কালে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন বেদে অভ্যস্ত থাকিলেও সামবেদে লব্ধগৌরব ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নামমাত্র কেহ চতুর্ব্বেদী হইলেও সম্ভবত সামবেদেরই সমধিক অনুরাগী ছিলেন। পরে তাঁহাদের সন্তানেরা নানাপ্রকারে সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে আসিয়া, বিশেষত তাঁহাদের পৌরোহিত্যের কবলে আসিয়া দায়ে পড়িয়া ক্রমশ সম্পূর্ণরূপে সামবেদী হইয়া পড়িলেন, আমাদের ইহাই অনুমান হয়।

(খ) বংশবিস্তার

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, পঞ্চব্রাহ্মণ যখন স্বদেশে জ্ঞাতিপরিত্যক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন, তখন তাঁহাদের যে ৫৬ পুত্র এক একটী গ্রাম পাইয়া গ্রামীণ বা "গাঁই" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সেই ৫৬ পুত্র আসিলেন কোথা হইতে? সপ্তশতী কন্যা বিবাহ করিয়া ঐ ৫৬ পুত্র উৎপাদন করিলে তবেই দু' দশ বৎসরে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের না হয় ৫৬ পুত্র হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে (২৩)। ইহার প্রতিবাদে আমরা প্রথমেই বলিতে চাই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আদিশূরের সভায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৯৯৯ সম্বতে যখন আসেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে অন্তত তিন জন খুবই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন—শ্রীহর্ষের ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর এবং দক্ষের ৬০ বৎসর হইয়াছিল। আদিশূরের জীবিতাবস্থায় পঞ্চব্রাহ্মণের পুত্রেরা "গাঁই" সংজ্ঞা পাইয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায় না। আদিশূর যদি ১০০৯ সম্বতে অর্থাৎ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনের প্রায় ১০ বৎসর পরে পরলোক গমন করিয়া থাকেন, তবে তো আদিশূরের মৃত্যুকালে বা ভূশূরের সিংহাসন আরোহণকালে শ্রীহর্ষের বয়স ১০০ এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৯০ এবং দক্ষের বয়স ৭০ হইয়াছিল। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, আদিশূরের দেহান্তের পরে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইয়া রাঢ়ে ফিরিয়া আসিলে পর "গাঁই"য়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় রাঢ়ীদের ন্যায় বারেন্দ্রদিগের ভিতর "গাঁই"-য়ের এপ্রকার প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পঞ্চব্রাহ্মণের ঐ বয়সে দশ পনেরো বৎসরের ভিতর ৫৬টি পুত্র হওয়া অসম্ভব ছিল। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এই সমস্যার আরও সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চব্রাহ্মণের প্রত্যেকের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কি মীমাংসা করা হইয়াছে দেখাইতে গেলে গ্রন্থ বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আমরা তাই কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপে ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধেই প্রেমবিলাসগ্রন্থের মীমাংসা আলোচনা করিয়া দেখিব। প্রেমবিলাস স্পষ্টরূপে ভট্টনারায়ণের ২১ পুত্র উল্লেখ ও তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করিলেও অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার ১৬ পুত্র বলিয়াই উল্লেখ আছে। ধ্রুবানন্দের মিশ্রী গ্রন্থে আছে—ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র (২৪)। কুলদীপিকা ও আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত ধরিয়া সম্বন্ধনির্ণয় ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র বলেন। ইহা ঠিক নহে। উপরোক্ত দুই গ্রন্থে কেবলমাত্র যে ১৬ পুত্র গাঁই হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২৪। ভট্টনারায়ণের কয় পত্নী ও কয় পুত্র।

সত্য কথা বলিতে কি, প্রেমবিলাস গ্রন্থে, কি কারণে জানি না, ভট্টনারায়ণ ব্যতীত অপর চারি জন ব্রাহ্মণের পুত্রগণসম্বন্ধে সাধারণত "পুত্রগণ" বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ভট্টনারায়ণের স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধেই গ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। প্রেমবিলাস বলেন—ভট্টনারায়ণের তিন পত্নী ছিলেন, এবং সেই তিন পত্নীর গর্ভে ২১ পুত্র জন্ম-

(২১) সং নিং।

(২২) ব্রা০ কা০ ৮৫ পৃঃ। বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই যুক্তি বিভিন্ন প্রণালীতে খণ্ডন করিয়াছেন।

(২৩) সং নিং।

(২৪) ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা—ধ্রুবানন্দের মিশ্রী গ্রন্থ সং নিং ২০পৃঃ।

গ্রহণ করেন (২৫)। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৫ জন, দ্বিতীয়ার গর্ভে ১০ জন এবং তৃতীয়ার গর্ভে ৬ জন জন্মেন।

১২৫। প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কে?

প্রথম পত্নীর গর্ভে ৫জন জন্মগ্রহণ করেন—আদি গাঁই ওঝা, আদিবিভাকর, আদিনাথ, আদিদেব এবং আদিভাস্কর। কেহ কেহ বলেন—"আদিগাঁই ওঝা সর্ব্বপ্রথম গ্রাম পাইয়া গ্রামীণ হইয়াছিলেন বলিয়া "আদিগাঁই" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমরা দেখি যে, ভট্টনারায়ণের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচ পুত্রেরই নামের সহিত "আদি"শব্দ সংযুক্ত আছে। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নারও গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম হইতেছে আদিবরাহ। ইহা হইতে বোধ হইতেছে, বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ সকল পুত্রের ঐরূপ নামকরণই হইয়া গিয়াছিল।

১২৬। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত কে?

দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—আদিবরাহ, নানো, গুপ্ত, মহামতি, গুণ, সহ, বটুক, শুভকান, নিহ্লো এবং গুই।

১২৭। তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত কে?

তৃতীয় পত্নীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—রাম, বিভু, গণ, নীপ, বিক এবং মধুসূদন।

এইরূপে আমরা দেখি যে, ভট্টনারায়ণের পশ্চিমদেশীয় তিন পত্নারই গর্ভে ২১টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর বয়সে পুনরায় এদেশের সপ্তশতী কন্যার সহিত চতুর্থ পক্ষ করিবার কথা নিতান্তই হাস্যকর নহে কি? ঋষিতুল্য পূর্ব্বপুরুষের প্রতি নিতান্ত অপমানজনক নয় কি?

১২৮। তৃতীয় পত্নী সপ্তশতীকন্যা হওয়া সম্ভব কি না?

ভট্টনারায়ণের প্রথম দুই পত্নী তো সপ্তশতীকন্যা নয়ই; তাঁহার তৃতীয় পত্নী সপ্তশতী কন্যা হওয়া সম্ভব কি না? আমাদের মতে তাহাও সম্ভব নহে। প্রেমবিলাস গ্রন্থে আমরা দেখি, ভট্টনারায়ণের একুশ পুত্রের মধ্যে প্রথম পত্নীজাত পাঁচ পুত্র বরেন্দ্রে ছিলেন এবং বাকী ষোল পুত্র রাঢ়ে গিয়া বাস করেন (২৬)। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি—প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৫৬টী পুত্র—ক্ষিতীশের ৭, বীতরাগের ১২, সুধানিধির ৭, মেধাতিথির ১৮, এবং সৌভরির ১২ (২৭)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতির ২৩টী পুত্র—ক্ষিতীশের ৫, বীতরাগের ৪, সুধানিধির ২, মেধাতিথির ৮, এবং সৌভরির ৪ (২৮)। আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতির পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নাম কুলতত্ত্বার্ণবে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিশূরের পুত্র ভূশূর যখন ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্রভূমি হইতে বিতাড়িত হন, কুলতত্ত্বার্ণবের মতে তখন ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্রই হউক বা ২৩ পুত্রই হউক সেই পুত্রগণের মধ্যে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ মাত্র পাঁচ ব্রাহ্মণই ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়ে চলিয়া আসেন (২৯)। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর ভট্টনারায়ণ ২৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া (৩০) ১০৩ বৎসর বয়সে উপরত হন। যাঁহারা বলেন যে, আদিশূর ক্ষিতীশ প্রভৃতি বা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যে পঞ্চব্রাহ্মণকে সাতশতকন্যা দেওয়াইয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়া গ্রামীণ বা "গাঁই" করিয়া দিয়াছিলেন। আদিশূর যদি ৯৯৯ সম্বতে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পরবৎসরের মধ্যেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ধরা যায়, তাহা হইলে তো এ সকল কথাই উঠিতে পারে না, কারণ কথিত আছে যে, সেই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশে গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তবে সাতশতীকন্যা দান করা হইয়াছিল—এদেশে ফিরিয়া আসিতে কোন্ না তিন চার বৎসর লাগিয়াছিল? আর যদি ধরা যায় যে, যজ্ঞের ১০ বৎসর বাদে ১০০৯ সম্বতে আদিশূর উপরত হন, তাহা হইলেও তিন চার বৎসর বাদে সেই পঞ্চব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে বাকী পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতর পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত সাতশতীকন্যা বিবাহ দেওয়াইয়া তাঁহাদের ৫৬টী পুত্র দেখিয়া,

(২৫) প্রে০ বি০ ২৬৪পৃঃ।

(২৬) প্রে০ বি০ ২৬৫পৃ।
(২৭) প্রে০ বি০ ২৬৩পৃঃ।
(২৮) কু০ ত০ ৮৭—৯১শ্লোক।
(২৯) কু০ ত০ ৯৫শ্লোক। (৩০) ক্ষি০ব ৫পৃঃ।

অন্তত ভট্টনারায়ণের ছয় পুত্র দেখিয়া, তাঁহাদিগকে গ্রামীণ করিয়াছিলেন, অথবা ভট্টনারায়ণের ঐ ছয় বৎসরে প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান জন্মিয়াছিল ধরিতে হয়। ইহার স্বাভাবিক অসম্ভবত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। তদ্ব্যতীত, একদিকে কুলতত্ত্বার্ণবে দেখি যে, ভূশূর কর্ত্তৃক রাঢ়দেশে আনীত ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের (পুত্রগণের মধ্যে) যে ৫৬ পুত্র রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন, ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর সেই ৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়াছিলেন (৩১)। অপর দিকে, প্রেমবিলাস বলেন, বল্লাল সেনের সময়ে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের আদানপ্রদান হইয়াছিল (৩২)। এই সকল কথার ভিতর যতটুকু সত্য থাক, ইহা হইতে আমরা অন্তত এটুকু সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, ভট্টনারায়ণের তৃতীয় পত্নীকেও কথনই সপ্তশতীকন্যা বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

১২৯। ভট্টনারায়ণের পুত্র।

ভট্টনারায়ণ গ্রাম প্রভৃতি পাইবার পর ২৪ বৎসর উহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোল পুত্রের নাম ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে দেখি—আদিবরাহ, বাটু, বাম, নান, নীপু, গুই, গুন্টু, অশান্ত, গুণ, বিক, অনিল, মধু, কাম, দেব, সোম, অদীন। এই গ্রন্থের সংস্করণকর্ত্তা জর্ম্মাণ পণ্ডিত হইলেও আমার মনে হয় যে, অন্তত ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্রের নামে কিছু ভুল করিয়াছেন। যাই হউক, ভট্টনারায়ণের মাত্র ষোল পুত্র যে গাঁই হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি—নাম ও উপাধি লইয়া বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু কিছু পার্থক্য দেখি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং রচয়িতা বিনয়ী বলেন যে, উক্ত ষোল পুত্রের সকলেই সদাচারী, বিদ্বান ও সর্ব্বমান্য ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম চারি পুত্র বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহারা স্নেহাধিক্যবশত দয়াশীল পঞ্চম পুত্র নীপুকে রাজনীতিকুশল ও বিষয়রক্ষণে সক্ষম দেখিয়া তাঁহাকেই নিজেদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নীপু কেশর গ্রামে সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম্মতৎপর হইয়া যথাধর্ম্ম ২৮ বৎসর প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সেই অবধি নীপুর বংশ কেশরগ্রামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন (৩৩)।

১২৯। ভট্টনারায়ণ গ্রন্থকার।

কুলগ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে মুনিসত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি মহত্ত্বব্যঞ্জক নানা বিশেষণে বিশেষিত করিলেও কোথাও তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া অভিহিত দেখি না। কিন্তু "ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ" পুস্তিকায় এবং অন্যান্য পুস্তকে তাঁহাকে অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা বলা হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় তাঁহার রচিত বলিয়া চারিখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে—কাশীমরণ মুক্তিবিচার, প্রয়োগরত্ন (ক্রিয়াকলাপসংক্রান্ত), বেণীসংহার নাটক এবং গোভিলসূত্রভাষ্য। ভট্টনারায়ণের রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ শ্রুত আছে, তন্মধ্যে বেণীসংহার নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আমরা জানি না, এই বেণীসংহার নাটককে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণ রচিত বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধরিতে পারি কি না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সংস্করণের মুখবন্ধে যতদূর বুঝা যায়, বেণীসংহারপ্রণেতা ভট্টনারায়ণকে ভট্ট রামেশ্বরসুত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থকে "মৃগরাজলক্ষ্মণ কবি ভট্টনারায়ণের রচিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩৪)। এ পর্য্যন্ত অপর কোন ব্যক্তিকে ঠিক "ভট্টনারায়ণ" রূপে পরিচিত হইতে দেখি নাই। এই কারণে অধিক সম্ভব মনে হয় এই যে, বেণীসংহার নাটক ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণেরই রচিত এবং সম্ভবত ক্ষিতীশেরই প্রকৃত নাম ছিল রামেশ্বর, উপাধি বা ডাকনাম ছিল ক্ষিতীশ। এমনও কি হইতে পারে না যে, রামেশ্বর বিশেষরূপে পণ্ডিত পণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া একসঙ্গে পিতা ও পুত্রের পরিচয় দিবার জন্য 'ভট্টরামেশ্বর পুত্র যাঁহার' এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করা হইয়াছে? বারেন্দ্রবংশাবলী বিচার করিলে মনে হয় আদিবরাহ ও রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিচার চলিয়াছিল।

(৩১) কু০ ত০ ১০০শ্লোক।
(৩২) প্রে০ বি০ ২৬৫পৃঃ।

(৩৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং ৪পৃঃ।
(৩৪) তদিদং কবে—মৃগরাজলক্ষ্মণো ভট্টনারায়ণস্য কৃতিং—বে০ স০ ৪পৃঃ।

দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও হিন্দুকলেজ।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

রামমোহন রায়ের স্কুল।

বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে গৃহশিক্ষকদিগের নিকটে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা এবং সঙ্গীতবিদ্যা ও ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। দ্বারকানাথ ও রামমোহন রায় উভয়েই হিন্দুকলেজ-স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু রামমোহন রায়ের অনুরোধে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দুকলেজে না দিয়া রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়িতে পাঠান। স্বয়ং রামমোহন নিজের গাড়ী করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ভর্ত্তি করিতে লইয়া যান। রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি ছিলেন। রামমোহন রায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিলে ১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সতীর্থের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন।

হিন্দুকলেজ, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ।

হিন্দুকলেজের ভিতর দিয়া তখন এক ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। হেনরি ভিভিয়ান্ ডিরোজিও নামে এক প্রতিভাবান ফিরিঙ্গি যুবক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য মনীষা ও হৃদ্যতার দ্বারা ছাত্রদের মন একেবারে দখল করিয়া লইলেন। ... ধর্ম্ম কিছু নয়, সমাজ কিছু নয়, ধর্ম্ম ও সমাজ বহুকাল ধরিয়া মানুষকে যে সকল সুদৃঢ় সংস্কারের জালে বাঁধিয়াছে তাহার বাঁধন না ছিঁড়িলে মানুষের মুক্তি নাই,—এই ভাবের একটা বিদ্রোহ তখন সমস্ত ইউরোপকে তোলপাড় করিয়াছিল। সেই ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এদেশকেও নাড়া দিল; ডিরোজিও সেই বিপ্লবের মন্ত্রে তাঁহার ছাত্রদিগকে দীক্ষিত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া একাডেমিক্ এসোসিয়েসন (Academic Association) নামে এক সভা খাড়া করিলেন। তাহাতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সেই সভায় স্বাধীনভাবে সামাজিক বিষয়ে বিচার চলিত এবং তাহার ফল ছাত্ররা নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে সমাজকে ধর্ম্মকে সকল রীতিনীতিকে নির্ব্বিচারে ঘৃণা করিতে সুরু করিয়া দিল। ...

রামমোহন রায় হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে খুসি ছিলেন না। ... যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হউক না, ছাত্ররা ধর্ম্মালোচনা করিতে শিখুক এবং অন্যান্য শিক্ষাকে সেই বড় শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়া জানুক, ইহাই ছিল রামমোহন রায়ের শিক্ষার আদর্শ।

হিন্দুকলেজের ধর্ম্মহীন নাস্তিকতার শিক্ষা সেই জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। ...

ডিরোজিও তখন যে ক্লাসে পড়াইতেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহার নীচের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুকলেজে প্রবেশের চার মাস পরেই ডিরোজিও হিন্দুকলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ... দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় চৌদ্দ বছর হইতে ষোল কি সতের বছর পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়াছিলেন। কলেজের সতীর্থগণের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হইয়াছিল এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ডিরোজিওর শিষ্যদলের সঙ্গে তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠতাই হয় নাই। ...

সৌভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেশীয় রীতিনীতি পোষাক-পরিচ্ছেদ, আহার-বিহার বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করিতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। (অজিত ২৮-৩৩)। রামমোহন রায় ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই ইংরাজী শিক্ষার যেটুকু ভাল তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয় রীতি-নীতি পরিত্যাগ করেন নাই; উভয়েই স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে অতিশয় তেজস্বিতা প্রকাশ করিতেন। এইজন্য হিন্দুকলেজের প্রথম ছাত্রদল কিছুকাল দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছিলেন। কিরূপে সদ্ব্যবহারের দ্বারা দ্বারকানাথ তাঁহাদিগকে বশীভূত করেন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

"তৎকালে ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী সংবাদ-পত্রের মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে এক পত্রিকা ছিল। এটী দ্বিভাষী ছিল (অর্থাৎ ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় লিখিত হইত)। হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার সম্পাদক ছিলেন।... এই পত্রিকায় একবার দ্বারকানাথের প্রতি বিদ্বেষে বিষাক্ত একটি আক্রমণ প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথের কোন আত্মীয় (যিনি স্বয়ং একজন পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন), দ্বারকানাথকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি গিয়া স্বহস্তে রসিককৃষ্ণ মল্লিককে চাবুক মারিয়া আসুন। দ্বারকানাথ এই পরামর্শ গ্রহণের পরিবর্ত্তে রসিককৃষ্ণকে

রাত্রির আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কাজটি অন্যায় হইয়াছে। রসিককৃষ্ণ দ্বারকানাথের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং দ্বারকানাথের প্রতি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কি করিয়া শত্রুতা দূর করিতে হয়, দ্বারকানাথ সংসারের অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা ভাল জানিতেন' ।—(Mem 41, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)। (১)

"কেবল রসিককৃষ্ণ নহেন, এই সময়ে হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি প্রধান। দ্বারকানাথ তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য অতি সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর বংশের দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও এই সকল নব্য যুবকদলের একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহা দ্বারা দ্বারকানাথ প্রত্যেককে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রত্যেকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া কাহার কি আশা ও উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়া লইতেন। এই সূত্রে দ্বারকানাথের সাহায্যেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পাদরী সমাজে বিশেষ আদরে গৃহীত হন, রামগোপাল ঘোষ বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং দিগম্বর মিত্র কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথের পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন।" (ব. জা. ই. ব্রা, ৬৩৩৪, ৩৩৫।)

ছেলে বয়সে রামমোহন রায়ের চরিত্রের ছাপ বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়াই দেশের শিক্ষিত সাধারণ যখন পশ্চিমের ধর্ম্ম সমাজ রীতি নীতি সমস্তকেই আদরে বরণ করিয়া লইলেন এবং দেশকে আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একাকী দেশের প্রাচীন সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইলেন; প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন; পাশ্চাত্য শাস্ত্র-সাহিত্য ছাড়িয়া প্রাচ্য শাস্ত্র-সাহিত্যের আলোচনা দেশময় ব্যাপ্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রামমোহন রায়ের পরে তিনি যদি এই কাজে না লাগিতেন, তবে দেশের শিক্ষিত লোক যে খৃষ্টান হইয়া সমাজে এক প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খলা ঘটাইত, সে বিষয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সবই ভাঙিত, কিছুই গড়িত না" (অজিত ৩৯, ৪০)

(১) ব. জা. ই. ব্রা পুস্তকের লেখক এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া (৬৩৩৪ পৃ:) কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত 'Anglo-Indian Press' কথাটির অর্থ ভুল বুঝিয়া জ্ঞানান্বেষণ'কে 'আঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদিগের একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। (রামতনু ১২৪, ১৩০, ১৪০, ১৪২, ১৫৫ পৃ: দ্রষ্টব্য)।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।

এখানে প্রসঙ্গতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের এই অতিরিক্ত পাশ্চাত্যানুরাগ ও প্রাচ্যবিরোধিতার উল্লেখ করিতে হইল বটে; কিন্তু সে সময়ে তাঁহারাই যে এ দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ কর্ম্মের অগ্রণী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতামন্ত্রের উপাসক ছিলেন, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাঁহাদিগের অনেকের জীবনচরিত স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তকে বিবৃত আছে।

রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুকলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রধান প্রধান যুবকগণ মিলিত হইয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে Society for the Acquisition of general Knowledge অথবা সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা স্থাপন করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে পরস্পরের সহায়তা করা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধন করা। প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন।

এই সভা যুবকগণের জ্ঞানবৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিলেও ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোনও আলোচনাই হইত না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মন সে সময় ঈশ্বর ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্নসকল লইয়া আন্দোলিত ছিল; এবং তিনি বহু কষ্টে একাকী নিজের একাগ্র চিন্তা দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছিলেন তাহাতে অপরের "সায়" পাইবার জন্য তাঁহার মনও হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইতেছিল। এই ব্যাকুলতা আত্মজীবনীর চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি এই সভা হইতে সাহায্য পান নাই।

হিন্দুকলেজের তৃতীয় ছাত্রদল।

হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতিকে প্রথম দল, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহপাঠীদিগকে দ্বিতীয় দল এবং রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণকে তৃতীয় দল বলা যাইতে পারে। এই তৃতীয় দলের অনেকের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল বলিয়া 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' হইতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন, আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন, সেকেণ্ড ক্লাশ

হইতে খৃষ্টীয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপস্ কলেজে ভর্ত্তি হন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও সুরাপাননিবারিণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিষ্টার। তিনি খৃষ্টীয়ান হইয়া বিলাত যান। তিনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিন কতক নিযুক্ত ছিলেন।... ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভূত যশের সহিত Inspector of School পদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন্ লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং "গার্হস্থ্যবিধি" প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন।... গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা 'পড়িতাম' না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্য্যন্ত আমরা পড়িতাম। ইনি কলেজ ছাড়িয়া ট্রেজারীতে এক উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।... ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত কুমারী তরুদত্তের পিতা। ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।"

(রা, জ, ২৭—২৯)।

হিন্দুকলেজের পাঠ্যতালিকা।

হিন্দুকলেজে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া-ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে দেবেন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান বি-এ পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষাও অধিক পড়িতে হইয়া-ছিল। সতের বৎসর বয়সের বালকের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই কঠিন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই শিক্ষা দ্বারাই তিনি (আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত) য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের গ্রন্থ বুঝিবার সামর্থ্যলাভ করিয়া-ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুমহাশয়ের প্রদত্ত (আত্মচরিত, ২০, ২১পৃষ্ঠা) প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা এই :—

"English Literature :—Becon's Essays. Shakespeare,—Macbeth, Lear, Othello and Hamlet. Milton—Paradise Lost, Lycidas Comus, L' Allegro, Penseraso Sonnets etc. Pope—Essay on criticism, Rape of the Lock, Eloisa to Abelard, Elegy on the death of a young Lady, Prologue to the Satires, etc. Young,—Night thoughts; Gray's Poems.

History : পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতরে পড়িতে হইত,—Hume's History of England (Unabridged), Gibbon's Roman Empire (Unabridged.) Mitford's History of Greece, Ferguson's Roman Re-public, Elphinstone's India. Russell's Modern Europe.

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভল্যুম হইবে।

Mathematics : Euclid.—First six books and Eleventh book. Algebra Plane and spherical Trigonometry. Analytical Conic Sections. Differential and Integral calculus

Mixed Mathematics : Whewell's Mecha-nics. Berkley's Astromony. Webster's Hydrostatics. Phelp's optics. Calculation of Eclipses."

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউয়েল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে সংস্কৃতকলেজ গৃহটী সৈনিকগণের সাময়িক আবাসে পরিণত হয়; এই জন্য কয়েকটী বিভিন্ন বাটীতে কলেজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী পত্রে জানা যায় যে, কলেজ ঐ সময়ে সহরের কোন অংশস্থিত তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে স্থানা-ন্তরিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগত হই-লাম যে, উক্ত তিনটী বাড়ীর দুইটী বর্ত্তমান বৈঠক-খানা রোডে অবস্থিত ছিল এবং আলবার্টকলেজ ভবনের একটী অংশ অপর বাটীর স্থানাধিকার করিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলেজ পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই উপ-লক্ষে কাউয়েল সাহেব একটী সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। রচনাটী এতদূর সুষ্ঠু যে, আমরা

উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। নিম্নে শ্লোকটী প্রদত্ত হইল :—

"বিদ্যালয়ঃ স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্
সমৃদ্ধকীর্ত্তির্ভুবনে ভবিষ্যতি।
তথাহি সানৌ মলয়স্য নান্যতঃ
ধ্রুবং সমারোহতি চন্দনদ্রুমঃ॥" *

(মলয়পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগে চন্দনবৃক্ষ যেরূপ সুনিশ্চিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্যালয় সম্প্রতি স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পৃথিবীতে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে।)

কাউয়েল মহোদয়ের অসীম প্রযত্নে সংস্কৃত কলেজ এই বৎসর বি-এ অধ্যাপনার অধিকার লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তাঁহারই প্রচেষ্টায় সংস্কৃতকলেজ সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পড়াইবার অধিকারও লাভ করে। কাউয়েল সাহেবের এই সময়কার একটী পত্রে জানা যায় যে, ঐ বৎসর সংস্কৃতকলেজের একটী ছাত্র † বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে লইয়া "Convocation meeting"এ যোগ দেন। উক্ত সভা তখন "টাউন হলে" হইত ; কাউয়েল সাহেব উহাকে "curious parody of our oxford" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখন অধ্যক্ষগণের আপনাপন বিদ্যালয়ের পরিচায়ক কোন চিহ্ন ছিল না বলিয়া কাউয়েল তাহার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং উক্ত উৎসবে জাঁকজমকাদির বিশেষ অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই সময়কার একটী পত্রে কাউয়েল সাহেব বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যে মতটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য না হইলেও সাধারণের অবগতি ও সমালোচনার জন্য নিম্নে পাদটীকায় মতটী সন্নিবেশিত করিলাম। * কোন একটী ইংরাজী কবিতা তাঁহার মনে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে উক্ত ভাবটি আনিয়া দিয়াছিল।

সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষপদে আরূঢ় হইবার পর তিনি প্রায় প্রত্যেক ছুটীতেই গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন ; সময় সময় রেঙ্গুন, বারাণসী প্রভৃতি স্থানেও তিনি ভ্রমণার্থ গমন করিতেন। এই সময় তাঁহারই যত্নে সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নামক নাটকের দুইটী পাণ্ডুলিপি দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত হইয়া সংস্কৃতকলেজ পুস্তকাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাতে ঐ পুস্তকটী বঙ্গদেশে প্রচারিত হইবার বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল। পরে অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সময়ে উক্ত পুস্তকটী তদানীন্তন গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।† এইরূপে তাঁহারই বিশেষ যত্নে বঙ্গদেশে অজ্ঞাতপ্রায় মহাকবি দণ্ডী বিরচিত "কাব্যাদর্শ" নামক বিখ্যাত অলঙ্কারপুস্তকটীর কয়েকখানি আদর্শপুঁথি পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হয় ; অনন্তর উহা সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহোদয় বিরচিত সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকায় বিভূষিত হইয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ‡ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে

---

* আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত হইতে।

† আমাদের মনে হয়, এই ছাত্রটী আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহোদয়। ইনিই সংস্কৃতকলেজের প্রথম উপাধিধারী। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, হাইকোর্টের উকিল ও রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃতকলেজের শতাব্দী উৎসবের সময় আমরা ইঁহাকে সশরীরে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বহু বিখ্যাত বঙ্গবাসী ইঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ৮৬ বৎসর এখন ১৮৫নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে (বিডন স্কোয়ারের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে) বাস করিতেছেন। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থটীতে ইঁহার বিষয় সম্যক্ জানিতে পারা যাইবে।

* "I was reading a very striking piece of poetry yesterday, on Bengal as a land without echoes physical or moral, as there are no mountains to break the dull monotony of its endless plain level, and no high ideas among its peeple and no greatnames in their past history to rouse them to emulation. The idea struck me very much. It is indeed sadly remarkable that Bengal with its 45 millions has hardly produced one known greatman,—there is not one great living Bengali now. Ram mohan Ray was their nearest approach to a great man, and he certainly was in many ways a remarkable man. But greatness and baboo-hood are incompatible ; and baboo hood is the beau ideal of existence to a Bengali"

(Life of professor Cowell. Page 169-70)

† পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত চণ্ডকৌশিক নাটকের ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত" ৪২—৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুবিখ্যাত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের কোন উৎকৃষ্ট মুদ্রিত সংস্করণ ছিল না। কাউয়েল সাহেবেরই বিশেষ যত্নে দেশদেশান্তরে মুদ্রিত কয়েকটী পুস্তক আনীত ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তর্কবাগীশ মহোদয় রচিত সংক্ষিপ্ত টীকায় বিভূষিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অবশ্য তর্কবাগীশ মহাশয় বহু পূর্ব্বে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত নাটকের টীকাবিহীন একটী সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণটী পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণটীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য। *

কলিকাতায় আসিয়া অবধি এদেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে কাউয়েল সংস্কৃতভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাকে এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কাউয়েল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, এই সূত্রে কাউয়েলের সহিত উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের যে সৌহৃদ্য জন্মিয়া যায়, আমরণ তাহা কথনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কাউয়েল সাহেবের যত্নেই ন্যায়রত্ন মহাশয় অলঙ্কারাধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। বহু বৎসর পরে কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে কাউয়েল সাহেব ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে পত্রাদি লিখিতেন তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তিনি যে কতদূর ভালবাসিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ একটী পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী তাঁহার অত্যন্ত তৃপ্তিকর হইয়াছে।

উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রতি কাউয়েল বরাবরই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কাউয়েল সাহেবের অধ্যক্ষতা কালেই তর্কবাগীশ মহোদয় সংস্কৃতকলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উহাতে সাহেব মহোদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, একটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিদায়সভায় উহা পাঠ করেন, শ্লোকটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আশাঃ সর্ব্বাস্তিমিরবলিতা অস্তলীনোঽংশুমালী-
ত্যুৎকণ্ঠাধোমুকুলিতদৃশোঽপ্যাকুলায়া নলিন্যাঃ।
অন্তঃপুষ্পং প্রতিনিধিরভূৎ স্বর্ণবর্ণাভরেণু
শ্চিন্তারূঢ়া বিরহিহৃদয়ে প্রোষিতস্যেব মূর্ত্তিঃ॥" *

(সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছে, দিক্‌সমূহ তিমিরাচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে—উৎকণ্ঠায় আকুল পদ্ম অধোভাগে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিতেছে। চিন্তামগ্ন বিরহিণীর হৃদয়ে বিদেশগত পতির মূর্ত্তিধ্যানই যেমন একমাত্র অবলম্বনের বিষয় হয়, তেমনি তপনবিরহিণী পদ্মিনীর অন্তরস্থ স্বর্ণোজ্জ্বলবর্ণাভা কণিকাই সূর্য্যের প্রতিনিধি হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে।)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। †

(শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল)

আজ আমরা যাঁহার স্মরণ সঙ্কল্প করিয়া এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি এবং তাঁহার সংস্রবে তাঁহার পরিবারমণ্ডলী বঙ্গদেশে নব যুগপ্রবর্ত্তনে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বঙ্গদেশের মধ্যে একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন এবং ব্যবসায়বুদ্ধিও তাঁহার বড় কম ছিল না। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা করেন। ইনি রোমে গিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্রাট্ পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপরে লণ্ডনে অবস্থিতিকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে ইংলণ্ডে গিয়া ইনি আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই, ইংলণ্ডেই দেহরক্ষা করেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ যখন বালক, সেই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি ও নানাবিধ যুগপ্রবর্ত্তক অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলই দেবেন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষাস্থল। এই অল্প বয়সেও বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের

---

* রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত" ৫২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন চরিত ৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

† গত ৩ই মাঘ কৃষ্ণনগরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং রামমোহনও দেবেন্দ্রনাথের সৎস্বভাব দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বাল্য হইতেই দেবেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম্মপ্রবণতার বীজ নিহিত ছিল। যখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর, তখন একদিন পিতামহীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিতে গিয়া, তাঁহার মনে ঐ বীজের প্রথম অঙ্কুর—বৈরাগ্যভাব দেখা দেয়। ইহার পরে অকস্মাৎ একদিন ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র তাঁহার চক্ষে পড়ে। পণ্ডিতের সাহায্যে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি উপনিষদ্ধর্ম্মের প্রতি বিশিষ্ট ভাবে আকৃষ্ট হইলেন। উহাই ঐ অঙ্কুরের প্রথম পল্লব। ইহার পর হইতে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের মন ক্রমশঃই ঔপনিষদ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

ঠিক একশত বর্ষ পূর্ব্বে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় "ব্রহ্মসভা" স্থাপন করেন। ঐ সভায় তিনি ও তাঁহার সমধর্ম্মী বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া পণ্ডিতের মুখে উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। তখন সভায় বসিয়া উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

কিছুকাল পরে রামমোহন বিলাতে চলিয়া গেলে প্রকারান্তরে দেবেন্দ্রনাথই রামমোহনের ব্রহ্মসভার উত্তরাধিকার গ্রহণ করিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "তত্ত্ববোধিনী" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে সেই সভার বন্ধুজনের সহিত গভীরভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে ঐ সভার সংস্রবে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" নামে মাসিক পত্রিকার উদ্ভব হইল। ঐ মাসিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চুপীনিবাসী অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি সুমার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। চারুপাঠের সুচারু রচনাগুলি প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইবে, ঐ তত্ত্ববোধিনীর দ্বারা শুধু ধর্ম্মালোচনার প্রচার নহে, সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি ও প্রচার হইতেছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভাতেও প্রথম প্রথম ব্রহ্মসভার ন্যায় উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। কিন্তু উহাতে দেবেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইতেছিল না। ক্রমে তিনি একটা প্রণালীবদ্ধ উপাসনার বিধান করিলেন। বোধ হয়, এই সময় হইতেই ঐ সভার নাম হইল "ব্রাহ্মসমাজ"—যাহা পরে "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে খ্যাত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ঐ সমাজ ও পত্রিকার কার্য্য চলিতেছে। পত্রিকারক্ষাকল্পে তিনি স্থায়ীভাবে দান বিধান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে কেশবচন্দ্রের আগ্রহ ও আনন্দ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" আখ্যায় ভূষিত করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মত সর্ব্বাংশে উপনিষদাশ্রয়ী হইতে চলিল দেখিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। তাহা হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের প্রীতি কখনই তিরোহিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে উপনিষৎমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপনিষৎজ্ঞান বিশেষ প্রকারে স্ফুরিত হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে মত তিনি প্রচার করিতেন, নিজ জীবনে তাহার সাধনা করিতে তিনি সততই সচেষ্ট থাকিতেন। এই সাধনার ফলে তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন—জীবনের অনেক সময় তিনি ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। বোলপুরের "শান্তিনিকেতন" নিভৃত ধ্যানপরায়ণ দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যবোধ (Æsthetic Sense) ও সর্ব্ববিষয়ে শোভনতাজ্ঞান তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রকাশ পাইত। তাঁহার এই সৌন্দর্য্যবোধ উচ্চস্তরের, অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া পরম সুন্দরের অনুভূতি হয়, দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যবোধ সেই স্তরের। শৈলাবাসে থাকিবার কালে তাঁহার মনে যে প্রগাঢ় ভগবৎস্ফুরণ হইত, তাহা ঐ সৌন্দর্য্যবোধসম্ভূত; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মন ভগবানের ঐশ্বর্য্য-শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া পড়িত।

বৈষয়িক কার্য্যপরিচালনে দেবেন্দ্রনাথ সবিশেষ

দক্ষ হইলেও তিনি ধর্ম্মের অবিরোধেই তাহা সম্পন্ন করিতেন। পিতৃবিয়োগের পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জমিদারী-সম্পত্তি বিপুল ঋণভারে পীড়িত, তখন তিনি প্রাকৃত বুদ্ধিবশে উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চনা করিবার কৌশলাদি না করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি সহকারে বিষয়ের বিপুল অংশ ত্যাগ করিয়া ঋণ-মুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন;—শুনা যায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিষয় বিসর্জ্জন করিয়া যদি তাঁহাকে ভিখারী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু তিনি উত্তমর্ণদিগকে তাহাদের প্রাপ্য ধনে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। সচরাচর বিষয়-সম্পন্ন লোকে যে বয়সে বিষয়চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, দেবেন্দ্রনাথ তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত পুত্রগণের প্রতি বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া ধর্ম্মসাধনায় একনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সর্ব্বদা উপনিষদের আলোচনা হইতে থাকায়, তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই বাল্য হইতেই উপনিষদের প্রভাবে ন্যূনাধিক প্রভাবিত। পিতার পক্ষে ইহা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ইহা ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথের গৃহই কলিকাতায় নানাবিধ কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং এখনও আছে। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ নানাবিধ সুখে এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মানন্দে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সফল করিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

সমগ্র বৎসর ধরিয়া দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে চলিতে মানুষ বড়ই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; জীবনে নবীনতার আস্বাদনের জন্য—সাধনার পথে নূতন আলোক লাভের জন্য মানুষ মাঝে মাঝে উৎসব চায়, উৎসব তাই ধর্ম্মজীবনের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই জন্য প্রতিবৎসর উৎসবের আভাস লইয়া যখন শীতের আলোকোজ্জ্বল প্রভাত ধরণীর বুকে নামিয়া আসে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন হৃদয়-মনের সঞ্চিত অন্ধকারও অনেকখানি অপসৃত হইয়া যায়। এবার ব্রহ্মোৎসবের প্রথমেই একটী মিলনের ভাব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং শেষে উহা 'সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে' পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

গত ৭ই পৌষ বুধবার প্রাতে মহর্ষিদেবের দীক্ষা-দিবস উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অনেকে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহদ্বারে, সেখান হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এবং শেষে মহর্ষিভবনের উপাসনামণ্ডপে আসিয়া যথারীতি উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন। অতঃপর ক্ষিতীন্দ্রনাথের গৃহে সকলে পুনর্ব্বার সমবেত হইয়া পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও প্রীতিবিনিময়পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সকলকে কমলালেবু ও সন্দেশ প্রভৃতির দ্বারা মিষ্টমুখ করাইয়া মহর্ষিদেবের ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের নিকট ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের আহ্বান আসিয়াছিল। এতদুপলক্ষে গত ১ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় তথায় ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। তদুপলক্ষে তিনি 'কর্ত্তব্যসাধন' বিষয়ে যে সময়োপযোগী উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ক্ষিতীন্দ্রবাবুর কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাণী দেবী, আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য প্রখ্যাত গায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদীয়মান গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

১০ই মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন ডাঃ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় পি-এইচ. ডি. ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। আদিব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস বেদীর নিম্নে দাঁড়াইয়া গম্ভীর কণ্ঠে ব্রাহ্মদিগের প্রতি একটী নিবেদন পাঠ করিলেন। নিবেদনটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল। উহার অক্ষরে অক্ষরে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার মর্ম্মব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিবেদনটী এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীকে আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অতঃপর আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ গম্ভীরোদাত্ত কণ্ঠে স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন। সর্ব্বশেষে ডাঃ শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সবল কণ্ঠে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন যে, উদারদর্শী রাজা রামমোহন-প্রবর্ত্তিত একমাত্র এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতবর্ষের নবোত্থিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবে।

গতবারের ন্যায় এবারও ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উৎসব-আয়োজন আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরেই হইয়াছিল। সমগ্র বৎসরের উপচিত আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হইয়া মন্দিরটী ফুলসজ্জার শুভ্রোজ্জ্বল উৎসবমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। ১১ই মাঘের পুণ্যতম প্রভাত শানাইয়ের সুরে সুরে সুরময় হইয়া দেখা দিল। ধূপ ধূনার পবিত্র গন্ধে, শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গল শব্দে ও পুষ্পসজ্জার সুষমাময় সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের আলোড়ন হইতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল, যেন দীর্ঘজীবনের সঞ্চিত পাপ-তাপ আজ ঐ পথের ধূলায় লুটাইয়া দিয়া শুচিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ত্রিতলের এই উপাসনামণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছি। বেলা ৮ ঘটিকার সময় সমবেত কণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—'যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু'। সঙ্গীতান্তে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ করিলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থতার কারণে এবার উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য প্রখ্যাত গায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটী সঙ্গীত করিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার মিলনভাবময়ী উদ্বোধনী বাণী শুনাইলেন। এবার নির্ম্মলচন্দ্র গাহিলেন—"এই আলোয় ভরা অসীম আকাশ সূর্য্যকিরণ ঢালা।" পরবর্ত্তী সঙ্গীতখানি বাণী দেবী কর্ত্তৃক বিবিধ তান-লয় সহকারে গীত হইলে ক্ষিতীন্দ্রবাবু গম্ভীরোদাত্ত কণ্ঠে স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন। স্বাধ্যায়ান্তে সুরেন্দ্র বাবু দুইটী গান করিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ও সবলকণ্ঠে "কথায় নয়—কাজে" বিষয়ে যে উপদেশ দান করিলেন তাহা যেমন তেজোদৃপ্ত তেমনই উৎসাহোদ্দীপক হইল। আমরা ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। আমরা সকলকে এই উপদেশটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অবশেষে যথারীতি সঙ্গীত হইবার পর উপাসনাকার্য্য সমাপ্ত হইল। শেষের দুইটী সঙ্গীত বিশেষতঃ সর্ব্বশেষের ক্ষিতীন্দ্রনাথরচিত রামপ্রসাদী সুরের—'(মন) প্রাণ খুলে গাও, মায়েরি নাম্' গানটী সমবেত কণ্ঠে গীত হইয়া সকলের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছিল।

সায়ংকালের উৎসব এবার যথারীতি মহর্ষিদেবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁহার উদ্বোধনী বাণী শুনাইয়াছিলেন; উপদেশের ভার লইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসুমিষ্ট কণ্ঠে সমবেত উপাসকবর্গকে এই বলিয়া উদ্বোধিত করিলেন যে,—"আজিকার এই উৎসবকে কোন সাম্প্রদায়িক উৎসব বলিয়া মনে করিলে আমরা ভুল করিব। সকল ধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক ভাবে প্রথমে উদ্ভূত হয় সাধকের অন্তরে। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সাংসারিক মানুষ তাহার উপর আপনাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব আরোপ করিতে গিয়া সাধকের সাধনাকে হারাইয়া ভেদবুদ্ধির প্রাচীর গড়িয়া তুলে। যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্ম এমনই করিয়া চিরদিন নিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কারাগারকে আজ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; অন্তরের মাঝে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে সেই সাধকের সাধনাকে, যিনি ৯৭ বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া আপন সাধনার আলোকে একাকী সত্যপথের সন্ধানে জয়যাত্রা করিয়াছিলেন।" অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের উপদেশ প্রধানতঃ সাধক কবি কবীরের 'দোঁহা' অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছিল। এই 'ভক্তবাণী' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনের প্রতিধ্বনি করিয়া ক্ষিতিমোহনবাবু ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক রূপের যে নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

সায়ংকালের সঙ্গীতগুলি এবার শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী—বালিকাগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।

১২ই মাঘ বুধবার উৎসবের 'শান্তিবাচন' হয়। এই দিন সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একত্র বেদীগ্রহণের কথা ছিল; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন কৃষ্ণকুমারবাবু বেদীর নিম্নেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু একাকী যথারীতি উদ্বোধন ও স্বাধ্যায় পাঠ করিলে কৃষ্ণকুমারবাবু রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র, ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রতিষ্ঠান এই আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন কাহিনী ও গৌরবের ব্যাখ্যা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাদিবসে বাঙ্গালার সমাজজীবনের কিরূপ ভীষণ অধোগতি ঘটিয়াছিল তাহা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনাপূর্ব্বক একটী নাতিদীর্ঘ উপদেশ দান করিলেন। অতঃপর যথারীতি সঙ্গীতাদি হইয়া শান্তিবাচনপূর্ব্বক উপাসনা ভঙ্গ হইল।

এবারকার ব্রহ্মোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসব'। সিটিকলেজের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ মণ্ডপ রচনা করিয়া গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই মাঘ দিবসত্রয়ব্যাপী এই ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন

ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উহার উদ্বোধনের কথা হয়। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 'যৌবনের জাগরণ' বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে আলোচনাসভায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৪ই মাঘ শুক্রবারের মহিলাসম্মিলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী অবলা বসু। ১৫ই মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় যে সর্ব্বশাখাসম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন উহা যেমন সত্যপূত তেমনই সুসঙ্গত ও উদ্দীপক হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন শাখাত্রয়ের মধ্যে কবে কোন্ পুণ্য-লগ্নে প্রথম মিলনের বাতাস বহিয়াছিল, তারপর কত অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভগবদিচ্ছিতে তাহার এই বর্ত্তমান পরিণতি, এসকলই ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের এই যে অধোগতি, তাহার পূর্ব্বলব্ধ স্থান হইতে এই যে পতন—এ সকলই একমাত্র সংহতিশক্তির অভাবেই ঘটিয়াছে; আজ যদি আমরা অতীতের সকল ত্রুটী-বিচ্যুতি বিস্মৃত হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারি, তবে আবার আমরা ভারতের জয়যাত্রায় অগ্রগামী সেবকরূপে বরিত হইব। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রকাশ করিব। এইদিন স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ ভি রায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সমাজসমস্যা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং স্বনামধন্য লর্ড সিংহ এই সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবের পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রার্থনা করিয়া যে প্রেমপূত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সভায় পঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে ভাই শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন সংকীর্ত্তনে উপাসনা পূর্ব্বক 'শান্তিবাচন' করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

উপরি-উক্ত সভাধিবেশন ছাড়া প্রতিদিন সায়ং-প্রাতে উপাসনা ও কথকতাদিরও আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কুচ-বিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রভৃতি সে সকলের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্মিলিত ব্রহ্মোৎসবের 'সার্ব্বজনীন' নামকরণ বড়ই সুসঙ্গত হইয়াছিল; কারণ এই উৎসব কেবল ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা পড়ে নাই—হিন্দু সমাজেরও বহু নর-নারী ইহা সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন।

এই উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগামী যুবকগণের উৎসহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়।

গ্রন্থপরিচয়।

অতি আধুনিক বাংলাকথা সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের দিল্লীনগরীস্থ পঞ্চমাধিবেশনে শ্রীঅমল কুমার হোম কর্ত্তৃক পঠিত। পৃষ্ঠা ১৯।

লেখক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিবর্দ্ধমান আধুনিক বাংলা গল্পসাহিত্যের দোষগুলি অতি বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রে উহাদের বিষময় প্রভাব নিখুঁতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র পুস্তকটীর কোন অংশেই আমরা কোন অবান্তর আলোচনার আভাস পাইলাম না—উহার প্রতি পংক্তিটীই সারবান্ বলিয়া মনে হইল; লেখক 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে সমূহ সৎসাহিত্যের লক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সূক্ষ্মানুভূতি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বাস্তব সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁহার 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'আর্ট ও সাহিত্যে' যে নির্ভীক সত্য উক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, লেখক কল্যাণকর-পথানুবর্ত্তী হইয়া সেই সত্য উক্তিরই আন্তরিক সমর্থন করিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। লেখকের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা আমরা শতবার করিব, জাতীয় চরিত্রে ইহা সুমিষ্ট ঔষধের ন্যায় কার্য্য করিবে। আমরা এবংবিধ জাতীয় কল্যাণকামী আরও লেখকের প্রত্যাশা করি; সুকঠিন ব্যাধিগ্রস্ত জাতীয় সাহিত্যকে নিরাময় করিবার ইহাই সহজলভ্য ঔষধ। শ্রীপঃ রাঃ।

রামায়ণ (বাল্মীকি অনুসরণে)।—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি মহাশয় প্রণীত। মূল্য ১॥০। পৃষ্ঠা ২৩১+৫।

পাঠকগণের নিকট দীননাথ বাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন আছে মনে করি না। সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক সান্যালমহাশয় রামায়ণের একটী সুন্দর সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থটী রচনা করিয়া লেখক বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ অভাব

মোচন করিয়াছেন। আদি কবি বিরচিত রামচরিত স্বতঃই মধুর, তদুপরি লেখকের রচনাভঙ্গী ইহাকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদেশে আরও কয়েকখানি রামায়ণ প্রচলিত থাকিলেও, এই রামায়ণ-রচনার প্রয়োজন কেন হইল?—গ্রন্থকার ভূমিকায় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানিকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত আকারে সুরচিত করিয়া সাধারণের সুখপাঠ্য করার জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ইহার প্রতিপত্রে গ্রন্থকারের পাকা হাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান। গ্রন্থের ভাষা এত সরল যে বালকেও উহা পাঠ করিয়া অনায়াসেই রসবোধ করিতে পারিবে; অথচ উহা গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট নহে। গ্রন্থকারের সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী এই যে, অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যেই তিনি নিপুণভাবে রামায়ণের সকল ঘটনাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথচ ইহার রসভাগও অব্যাহত রাখিয়া গিয়াছেন। এইখানেই পাকা হাতের পরিচয় ইহা বালক-বালিকাগণকে উপহার দিবার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার ইচ্ছা করি। আমাদের মনে হয়, এরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীরও পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন—"ভারতে আর্য্যসভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল, রামায়ণ সেই সময়ের কাব্যাভিব্যক্তি। সুতরাং সেই যুগের বাণী, আদর্শ ও ধারা··· জানিতে ও বুঝিতে হইলে ঐ রামায়ণের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।" কবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ একখানি খুব ভাল গ্রন্থ হইলেও মূল রামায়ণের সমসাময়িক চিত্র তাহাতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই কার্য্যবাহুল্যের দিনে কিঞ্চিদধিক ২৪০০০ শ্লোকের কাব্যগ্রন্থ পড়িবার অবসর খুব অল্প লোকেরই আছে। তাই মূল রামায়ণে বিকশিত আর্য্যসভ্যতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন ও চিত্রের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইবার জন্যই লেখক সরল গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের এই সার সঙ্কলন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

৺নীলিমা দেবী।—তত্ত্ববোধিনী ও অন্যান্য বাঙ্গালা মাসিকের লেখক, কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের ৯ম বৎসরের কন্যা কুমারী নীলিমা দেবী বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কন্যা-বিয়োগ বিধুর পিতাকে আমরা আমাদের হৃদয়ের সুগভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান বালিকার লোকান্তরিত আত্মাকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করুন।

দান-প্রাপ্তিস্বীকার।

১৮৪৭ শক।

(১৮৪৫ ও ৪৬ শকের দানপ্রাপ্তি ১৮৪৭ শকের শ্রাবণ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

এককালীন দান।

রায় সাহেব শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন	৩৲

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সুকুল	৫৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১৲
" অমূল্যকৃষ্ণ সেন	১৲
" সুধীরচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
" বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত	॥০
" বিজয়কৃষ্ণ দত্ত	।০
" হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
" সুশীলকুমার গুপ্ত	১৲
" উমাচরণ মিত্র	১৲
" বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
" তুলসীদাস দত্ত	২৲
" বিজয়চন্দ্র সিংহ	৫৲
" অবিনাশচন্দ্র বসু	১৲
" কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	১০৲
	২৯৸০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৫৲
" হিরণ্ময়ী দেবী	৩৸/০
	৮৸/০
মোট	৪৬॥/০

১৮৪৮ শকের বৈশাখ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত।

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	২৫৲
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক	১০০৲

বাৎসরিক দান।

পি. মুখার্জ্জি এস্কোয়ার	৬৸/০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ	১০৲
শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু	৫৲

বিশেষ কার্য্যের দান।

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক	১৲
শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক	১৲
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল	১৲
	১৪৯৸/০